Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২ জুন, ২০২০

৪৩ বর্ষ ১৩ সংখ্যা ১ জুন, ২০২০, সোমবার, ১৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৭

বিশেষ সম্পাদকীয়

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় চলে গেলেন সময় তাঁকে ভুলবে না

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়। নতুন চিঠির প্রাণপুরুষ। বিশিষ্ট সমবায়ী মানবহিতৈষী এক মহান মানুষের জীবনদীপ নির্বাপিত হলো। জীবন সংগ্রামে বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে তিনি শ্রমজীবী মানুষকে সংগঠিত করে সমাজবদলের স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ণের একনিষ্ঠ সৈনিক। সেই সূত্র ধরে বঞ্চিত নর-নারীর জীবনে স্বচ্ছলতা না হলেও দু-বেলা দু-মুঠো আহার যোগানোর ভাবনা তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে। কাকদ্বীপ থেকে সালানপুর, আলিপুরদুয়ার থেকে সমুদ্র-উপকূল। সমবায়ের মধ্যে সমবায় হিসাবে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠন করে মানুষকে আত্মনির্ভর করে তোলার প্রচেষ্টায় সারা দেশ এবং বিদেশেও ছুটে বেরিয়েছেন যে মানুষটি, তাঁর নাম অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়। নিপীড়িত শোষিত, বঞ্চিত মানুষের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠুক 'নতুন চিঠি', এই আন্তরিক তাগিদে 'সত্যযুগ' পত্রিকার জেলা সংবাদতাতা থেকে হয়ে ওঠেন সাপ্তাহিক 'নতুন চিঠি' পত্রিকার প্রকাশক ও সম্পাদক। পাশাপাশি নিরন্তর লড়াই চালিয়ে গেছেন খেতমজুরের মজুরির জন্য, বড় জমির মালিকের হাত থেকে বে-আইনি জমি পুনরুদ্ধার করে গরিব কৃষকদের হাতে তুলে দেবার জন্য। সেই সঙ্গে চালিয়ে গেছেন মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের নানান দাবি-দাওয়ার লড়াইও। বামফ্রন্ট সরকারের সীমাবদ্ধ অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ক্ষমতার মধ্যেও গরিব, প্রান্তিক মানুষকে আত্মনির্ভর করে গড়ে তোলার লড়াই। মহাজনী শোষণে নিষ্পিষ্ট কৃষক সহ সমস্ত বঞ্চিত মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর লড়াই। এবং সব লড়াইয়ের মূলে শ্রমিকশ্রেণির শোষণের বিরুদ্ধে, মানবমুক্তির লড়াইয়ের অপ্রতিরোধ্য সৈনিক ছিলেন অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়। চেতনা ও কর্মের সংশ্লেষে সৃষ্ট এক পরিপূর্ণ মানুষ। 'নতুন চিঠি'র গর্ব। আমরাও গর্বিত এরকম একজন অসাধারণ মানুষের সান্নিধ্যে কাজ করার সুযোগ পেয়ে। স্বভাবতই তাঁর এই লড়াই-সংগ্রামের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব আমাদেরও।

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরা স্মরণে রাখবো শুধু স্মরণের জন্য নয়, তাঁর আদর্শকে অনুসরণ করে তাঁর অসম্পূর্ণ কাজকে সম্পূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রতিজ্ঞায়।

নতুন চিঠি-র প্রাণপুরুষ ও কমিউনিস্ট সংগ্রামী অশোক ব্যানার্জী প্রয়াত

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : নতুন চিঠি-র প্রাণপুরুষ, প্রতিষ্ঠাতা, বিশিষ্ট সমবায়ী, মানবদরদী ও কমিউনিস্ট অশোক ব্যানার্জী ২৯ মার্চ ১১টা নাগাদ বর্ধমানের এক বেসরকারি নার্সিংহোমে প্রয়াত হয়েছেন। একদিকে শিক্ষকতা, সাংবাদিকতা, কৃষক সহ শ্রমজীবী মানুষের সংগঠক ও সমবায়ী হিসাবে দেশ ও দেশের বাইরে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। করোনা সর্তকতার মধ্যে নীরবে চলে গেলেন প্রচারবিমুখ এই মানুষটি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। মানবদরদি অশোক ব্যানার্জী তাঁর মরদেহ দান করেছিলেন মানব কল্যাণে চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণা ও অনুসন্ধানের জন্য। তাঁর ইচ্ছানুসারেই কোন শোভাযাত্রা ছাড়া তাঁর মরদেহ তুলে দেওয়া হয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনুসন্ধানের জন্য বর্ধমান মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষের হাতে। তিনি রেখে গেছেন স্ত্রী গৌরী ব্যানার্জী ও অসংখ্য গুণমুগ্ধ সহকর্মীকে। এদিন নার্সিংহোম থেকে তাঁর মরদেহ সিপিআই(এম) জেলা দপ্তরে নিয়ে আসা হয়। তাঁর মরদেহ রক্তপতাকায় ঢেকে দেন প্রবীণ সিপিআই(এম) নেতা অরিন্দম কোঙার ও অমল হালদার। তাঁকে শ্রদ্ধা জানান অরিন্দম কোঙার, অমল হালদার, মদন ঘোষের পক্ষে মাল্যদান করে। শ্রদ্ধা জানান আভাস রায়চৌধুরী, তাপস সরকার, গৌরী ব্যানার্জী, অপূর্ব চ্যাটার্জী নজরুল ইসলাম, তরুণ রায়, কাকলি গায়েন সহ বহুজন। মাল্যদানের পর মরদেহবাহী শকট চলে যায় বর্ধমান মেডিকেল কলেজে। বহু বিশিষ্টজন শোকজ্ঞাপন করেছেন তাঁর প্রয়াণে।

মানুষ

(অশোক ব্যানার্জীকে মনে রেখে)

মলয় রায়

প্রবল জোয়ারেও
যেমন আবেগহীন,
ভাটার টানেও
একই মানুষ।

মৃত্যুর পরও
সেই মানুষ
অবিরত অনির্বাণ।

মুঠো ভর্তি
শস্যদানা নিয়ে
প্রতিদিন

পা রাখে জমির আলে
চেতনার চৌকাঠে।।

গ্রাহক ও পাঠকদের প্রতি

করোনা সতর্কতার কারণে ২৪ মার্চ হতে ধারাবাহিক লকডাউনের ফলে 'নতুন চিঠি' পত্রিকা প্রকাশিত হয়নি। এরই মধ্যেই আমরা হারিয়েছি 'নতুন চিঠি'-র প্রতিষ্ঠা ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জীকে। তাই এই সংখ্যাটি তাঁকে নিবেদিত করেই প্রকাশিত হল। এর পর প্রতিটি সংখ্যায় তাঁর উপর বিভিন্ন জনের লেখা থাকবে।

— কর্মাধ্যক্ষ, নতুন চিঠি

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক মোহিত ভট্টাচার্য প্রয়াত

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মোহিত ভট্টাচার্য ৪ এপ্রিল প্রয়াত হন। অধ্যাপক ভট্টাচার্য 'নতুন চিঠি' পত্রিকার একজন সুহৃদ ছিলেন। এক দিকে যেমন তিনি নতুন চিঠি শারদ সংখ্যায় লিখতেন, তেমনি তিনি নতুন চিঠি আয়োজিত অন্তত তিনটি জাতীয় স্তরের সেমিনারে পৌরোহিত্য করেছেন। ১৯৮৮-৯৬ দুটি টার্মে তিনি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। তাঁর সময়কালেই বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে ও শহরের জনমানসের মধ্যে একটি সুদৃঢ় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাঁর সময়কালে বর্ধমান

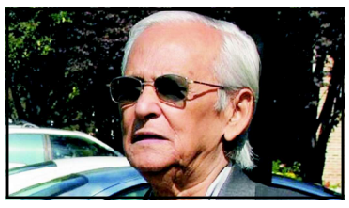

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মানোন্নয়ন ও বহু নতুন নতুন বিভাগ যেমন গড়ে ওঠে, তেমনি সৌন্দর্যায়ন ও সামাজিক দায়বদ্ধতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশগ্রহণ বেড়েছিল। নতুন চিঠি পত্রিকা তাঁর এই সুহৃদের প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছে ও তাঁর স্ত্রী কৃষ্ণা ভট্টাচার্য ও পুত্র সুমিত ভট্টাচার্যকে গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে।

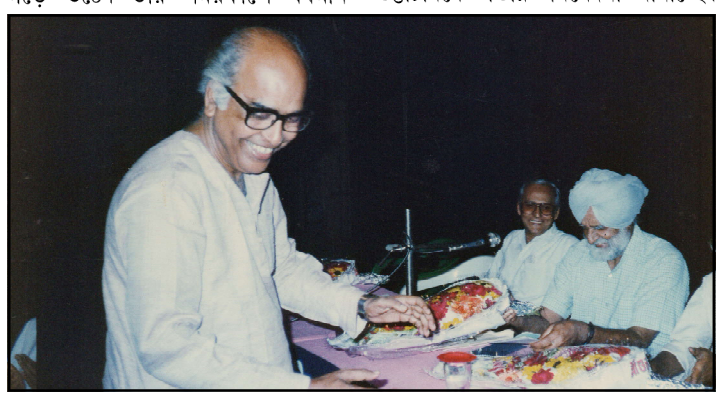

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জে.এন.ইউ-র এ্যামিরিটাস অধ্যাপক রণধীর সিং-এর সঙ্গে অধ্যাপক মোহিত ভট্টাচার্যকে পুষ্পস্তবক প্রদান করছেন নতুন চিঠির সম্পাদক জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য।

স্মৃতির দর্পণে অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য

তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এক বিরল ব্যক্তিত্ব। মার্কসবাদী বিশ্ববীক্ষায় আলোকিতচিত্ত, প্রকৃত অর্থেই একজন কমিউনিস্ট, রাজ্য ও সর্বভারতীয় স্তরে বিভিন্ন জনমুখী কর্মধারায় ও রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামে আত্মনিবেদিত। বিশেষ করে দেশব্যাপী সমবায় ও স্বয়ম্ভর আন্দোলনের তিনি ছিলেন অগ্রপথিক এবং তৎসংশ্লিষ্ট রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্তরের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংগঠনের উচ্চতম পদে সগৌরবে আসীন। ভারত সরকার প্রদত্ত 'সমবায় রত্ন' উপাধি এক্ষেত্রে তাঁর অতুলনীয় অবদানেরই সর্বোচ্চ স্বীকৃতি। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও তাঁর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। তিনি ছিলেন 'নতুন চিঠি' পত্রিকার প্রাণপুরুষ—তার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, প্রকাশক ও পরবর্তীকালে গঠিত 'নতুন চিঠি ট্রাস্ট'-এর সভাপতি। তিনি অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়। শারীরিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ লড়াই চালিয়ে অবশেষে গত ২৯ মার্চ ৮৩ বছর বয়সে তিনি আমাদের ছেড়ে চিরতরে চলে গেলেন। শরীর বিজ্ঞানের গবেষণার স্বার্থে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে তাঁর নিজের দেহটিও তিনি দান করে গিয়েছেন। কিন্তু দুঃখ এই যে তাঁর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপনে অনুরাগী জনগণের যে সমাবেশ স্বাভাবিক ও অনিবার্য ছিল তা সম্ভব হলো না, কেননা এমন একটি দুঃসময়ে তিনি প্রয়াত হলেন যখন করোনা-আক্রান্ত দেশের সুকঠিন

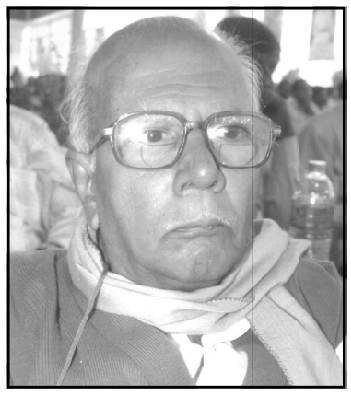

লকডাউন পরিস্থিতিতে শারীরিক দূরত্বের নির্দেশনায় যে-কোনো সমাবেশ ছিল নিষিদ্ধ।

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনকৃতির সামগ্রিক আলোচনা একটি লেখায় সম্ভব নয়, সে যোগ্যতাও আমার নেই। আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে যতটা যেভাবে দেখেছি, সেই অভিজ্ঞতার আলোকেই তাঁকে সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করতে পারি। বহুমাত্রিক যোগাযোগের মাধ্যমে অশোকবাবুর সঙ্গে আমার সম্পর্ক আনুষ্ঠানিকতাকে অতিক্রম করে আন্তরিক সম্পর্কে পরিণত হয়েছিল, ব্যক্তিগত পর্যায় পেরিয়ে প্রসারিত হয়েছিল পারিবারিক স্তর পর্যন্ত। তাঁর স্ত্রী গৌরী ব্যানার্জী ছিলেন এবং এখনও আছেন একই রাজনৈতিক সংগ্রামের পথে। কন্যা তোতার অকালমৃত্যুর মর্মন্তুদ বেদনা বহন করেই বৃহত্তর সংগ্রামের পথে তাঁরা এগিয়ে গেছেন। অশোকবাবু চলে গেছেন, সেই সব-হারানোর বেদনা নিয়েও গৌরী ব্যানার্জী এখনও এগিয়ে চলেছেন সেই অঙ্গীকারবদ্ধ পথেই।

পূর্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গে শিক্ষা ও শিক্ষকতার নানা পর্যায় পেরিয়ে ১৯৬৫ সালে আমি অধ্যাপক হিসাবে রাজ কলেজে যোগদান করি। সেই সূত্রে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আমার ক্রমবর্ধমান সংযোগ অশোকবাবুর সঙ্গে সংযোগকেও ক্রমশ

—এরপর পাঁচের পাতায়

নতুন চিঠি

১ জুন, ২০২০

করোনা প্রতিরোধে কী করণীয়?

লক্ষণরেখার বাইরে এবার আনলক-ওয়ান হতে চলেছে। করোনা পর্বের বন্দিদশা থেকে ধাপে ধাপে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে। প্রথম দফায় ৮ জুন থেকে খুলবে ধর্মীয় স্থান, হোটেল, রেস্তোরাঁ, শপিং মল, অবশ্য সবই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর মেনে। দ্বিতীয় দফায় জুলাই মাসে স্কুল, কলেজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কোচিং খোলার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হবে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির সঙ্গে আলোচনা করে। তৃতীয় দফায় পরিস্থিতি বিচার করে স্থির হবে আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবা। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক অনুমতি দিয়েছে খুলতে পারে মেট্রো রেল, সিনেমা হল, জিমনেশিয়াম, সুইমিং পুল, এন্টারটেইনমেন্ট পার্ক, থিয়েটার, পানশালা, অডিটোরিয়াম, অ্যাসেম্বলি হল, সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, খেলা, বিনোদন, শিক্ষা, সাংস্কৃতিক/ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং অন্যান্য বড় জমায়েত।

প্রশ্ন রেল চলাচল নিয়ে। গণপরিবহণ ব্যবস্থার কী হবে? দেশে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। ২৪ ঘন্টায় ৮০০০ সংক্রমণ ঘটেছে। আক্রান্তের প্রায় অর্ধেক পরিযায়ী, দুশ্চিন্তায় রাজ্য।

কলকাতায় আবার চুল্লি খারাপ, করোনায় মৃতদের দাহ করার কাজ প্রায় এক সপ্তাহ ধরে থমকে আছে। সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালের মর্গে একাধিক মৃতদেহ পচছে। এই অবস্থায় লকডাউন তোলা হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই রাজ্যবাসী আতঙ্কিত।

সিপিআই(এম)-এর ত্রাণ তহবিলে ৭০ হাজার টাকা দান

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : আমফান ঘূর্ণিঝড়ে বিপর্যস্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে শনিবার প্রয়াত ডাঃ অনাথবন্ধু ঘোষের পরিবারের সদস্যরা ৭০ হাজার টাকা সিপিআই(এম)-এর ত্রাণ তহবিলে দান করলেন। এই অর্থ প্রয়াত ডাঃ ঘোষের পরিবারের পুত্র, পুত্রবধূ, নাতি-নাতনিদের সকলের মিলত ইচ্ছা ও সকলের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সংগৃহীত হয়েছে। সিপিআই(এম) বর্ধমান শহর-২ এরিয়া কমিটির সম্পাদক তরুণ রায়ের হাতে এই অর্থ তুলে দেন পরিবারের পক্ষে পারুল ঘোষ, সোমা ঘোষ। ছিলেন তড়িৎ ঘোষ ও কল্লোল ঘোষ। উল্লেখ্য, অনাথবন্ধু ঘোষ ১৯৭১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে পার্টির প্রার্থী হিসাবে ভাতার কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিধায়ক হিসাবে নির্বাচিত হন। তখন জেলা পার্টির পক্ষে এই কেন্দ্রের দায়িত্বে ছিলেন প্রয়াত বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী।

বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দেহ দানের সময় সহধর্মিনী গৌরী ব্যানার্জী।

এক আপনজনের কাহিনি

অরিন্দম কোঙার

মর্মান্তিক

তখন নোভেল করনা ভাইরাসের আক্রমণ চলছে। সেই আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য লকডাউন জারি। রাস্তাঘাটে চলাফেরা করা নিষেধ, মানুষের পরস্পর কাছে আসা বন্ধ। সেই পরিস্থিতিতে সদা-ব্যস্ত এক মানুষের জীবনদীপ নিভে যায়। বর্ধমান শহরে ২০২০ সালের ২৯ মার্চ। প্রায় অলক্ষ্যে, প্রায় অজান্তে। অথচ তিনি অনেকেরই আপনজন ছিলেন। অসংখ্য তাঁর গুণমুগ্ধ। তাঁর ইচ্ছানুযায়ী তাঁর মৃতদেহ বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়ার সময় উপস্থিত থাকার সুযোগ পেয়েছিলেন তাঁর স্ত্রীসহ জনা পাঁচেক মানুষ। কী বেদনাদায়ক! কী মর্মান্তিক!

সদা-ব্যস্ত

সদা-ব্যস্ত সেই মানুষটা হচ্ছেন অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়। কমরেড অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়। বর্ধমান জেলার একটা গ্রামে ব্যস্ততা শুরু। তারপর প্রসারিত হতে হতে জেলা, জেলা থেকে রাজ্য, রাজ্য থেকে দেশে। ব্যস্ততা সমবায়ের জন্য, ব্যস্ততা কমিউনিস্ট পার্টির জন্য, ব্যস্ততা কোনো মানুষের চিকিৎসার জন্য, ব্যস্ততা কোনো মানুষের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য, ব্যস্ততা সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের জন্য। চার দশক ডায়াবেটিস রোগ সঙ্গী ছিল, চোখের দৃষ্টি ছিল ক্ষীণ, শেষের দিকে পারকিনসন রোগ থাবা বসিয়েছিল। কিন্তু কাজের বিরাম নেই। চেনা-অচেনা মানুষের সঙ্গে সহজেই পরিচিত হতে পারতেন এবং ক্রমে তাঁদের সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়ে যেতেন। ফলে ব্যস্ততা থেকেই যেত। শেষের দিকে বছর দুয়েক একা এখানে-ওখানে যেতে পারতেন না, তবু যেতেন অপরের সাহায্যে।

কর্মজীবন

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সারা জীবন সংগ্রামী জীবন। জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রাম। পারিবারিক আর্থিক সচ্ছলতা ছিল না। শেষ পর্যন্ত উচ্চশিক্ষা অসমাপ্তই থাকে। তবে প্রাইভেটে স্নাতক হন। সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজে পড়ার সময় ছাত্র ফেডারেশনের সঙ্গে যুক্ত হন। পরে কমিউনিস্ট নেতা হিসাবে পরিচিত হন।

তবে কমিউনিস্ট নেতা হিসাবে পরিচিত হওয়ার আগে অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচিত হন সমবায়ী হিসাবে। জীবিকার অন্বেষণে এখানে-ওখানে ঘোরাঘুরি করে কিছু কিছু রোজগার করে শেষ পর্যন্ত বর্ধমান সদর থানার রায়ান মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকপদে ব্রতী হন, 'মাস্টারমশাই' হিসাবে এলাকায় প্রিয় হয়ে ওঠেন। সেখান থেকে চলে আসেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী হয়ে। শেষ পর্যন্ত রাজনীতিকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন, চাকরিতে ইস্তফা দেন। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সমিতির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন সর্বোচ্চ সংখ্যায় কর্মচারীদের সমর্থন নিয়ে।

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে রামনারায়ণ গোস্বামী যখন জনস্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন, তখন অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর আপ্ত-সহায়কের দায়িত্ব পালন করেন।

সংস্কৃতি-মনস্ক মানুষ ছিলেন অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিয়ের আগে ও পরে তাঁর পরিবারে সাংস্কৃতিক পরিবেশ ছিল। অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় তবলা ও বেহালা বাজাতে পারতেন, অভিনয় করতে পারতেন। তাঁর স্ত্রীর অভিনয়ে দক্ষতা ছিল, মেয়ে আবৃত্তি করত, অভিনয় করত। অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃদুল সেন, অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিরা স্থাপন করেন সাংস্কৃতিক সংস্থা 'অন্বেষা'। এই সংস্থা শহরে-গ্রামে অনেক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করেছে। উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা 'হারানের নাতজামাই' নাটক।

অর্থনীতির বিশ্বায়নের কালে কৃষকের দুরবস্থায় অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করতেন, "এই পরিপ্রেক্ষিতের উপর দাঁড়িয়ে প্রথম যে কাজটি করতে হয় তা হল খরচ কমিয়ে এনে জমির উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন বাড়ানো, চাষের বৈচিত্র্য এনে ও কৃষির নিবিড়তা বাড়িয়ে, কৃষককে স্বনির্ভর করে গড়ে তোলা, কৃষককে নতুন কৃৎকৌশলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া, বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ করার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, কৃষির সঙ্গে কৃষি-সম্পর্কিত পশুপালন, মৎস্য চাষ, বীজ উৎপাদন, জৈব সারের উৎপাদন, শস্য প্রক্রিয়াকরণ ও গ্রাম্য ক্ষুদ্র শিল্প তৈরি করে প্রতি পরিবারের একজনের কাজের ব্যবস্থা করে কৃষককে স্বনির্ভর করা।" (প্রাক্‌কথন, স্বনির্ভরতার সন্ধানে) এই উপলব্ধি থেকে স্থাপিত হয় 'সংকল্প পিপলস্ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি'। অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি।

ঠিক তেমনি 'নতুন চিঠি' সাপ্তাহিকের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়। সাপ্তাহিকটা পরিচালনায় তিনি শেষ পর্যন্ত যুক্ত থাকেন।

রাজনৈতিক পরিচয়

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় ছাত্র-রাজনীতিতে তো যুক্ত ছিলেনই, বৃহত্তর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আসেন বিশ শতকের ছয়ের দশকে কৃষক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। সংস্পর্শে আসেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র তৎকালীন বর্ধমান জেলা কমিটির সম্পাদক সুবোধ চৌধুরীর। অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৬৭ সালে পার্টির সভ্যপদ অর্জন করেন এবং ১৯৮১-২০১১ পার্টির বর্ধমান জেলা কমিটির সদস্য ছিলেন। কেবল উপরের দিকের কমিটি নয়, শাখাস্তর পর্যন্ত তিনি পার্টিসভায় যেতেন, পাড়া বৈঠক করতেন, নির্বাচনের সময় বাড়ি বাড়ি ঘুরতেন। তাঁর এলাকায় এমন কোনো পার্টিকর্মী ছিলেন না যাঁকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন না।

কৃষক ও কৃষিসমস্যা অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় ভালোই বুঝতেন, হাতে-কলমে কৃষক আন্দোলন করেছেন, পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষকসভার রাজ্যস্তরের নেতা হয়েছেন।

আধা-ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাসের সময় ১৯৭১ সালে কংগ্রেসী গুণ্ডাবাহিনীর প্ররোচনায় পুলিশের হামলায় গুরুতরভাবে জখম হন। মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে তাঁকে মাংসপিণ্ড আকারে জেলে নিক্ষেপ করা হয়। এই ঘটনার আগেই ১৯৭০ সালে তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় যাওয়া বন্ধ করতে হয়, এমনকী এলাকা পর্যন্ত ছাড়তে হয়।

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় কমিউনিস্ট জীবন অতিবাহিত করতেন। সাচ্চা কমিউনিস্ট নির্ধারণের মাপকাঠিতে তিনি সাচ্চা কমিউনিস্ট। সততা, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, মমত্ববোধ, একাগ্রতা, আদর্শবোধে তিনি ছিলেন কমিউনিস্ট প্রতীক। তাঁর সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক দক্ষতা প্রশ্নাতীত। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান, পশ্চিমবঙ্গ পরিকাঠামো উন্নয়ন অর্থ নিগমের চেয়ারম্যান ইত্যাদি কত বড় বড় পদের দায়িত্ব সামলেছেন, 'সমবায় রত্ন', 'বর্ষসেরা সমবায়ী' ইত্যাদি নানা সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। কিন্তু সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি পরিহিত অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় সেই পরিচিত আন্তরিক অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ই থেকে গেছেন, সঙ্গে থেকেছে খাবার হিসাবে প্রায় তেলহীন নুনহীন সেদ্ধ শাক-সব্জি সমেত একটা টিফিন বাক্স। এর কোনো ব্যত্যয় হয়নি।

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কমিউনিস্ট সত্তার একটা বড় দৃষ্টান্ত হচ্ছে তাঁর পরিবার। কমিউনিস্ট পরিবার। স্ত্রী গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র অবিভক্ত বর্ধমান জেলা কমিটির সদস্যা, বর্তমানে পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির সদস্যা। একমাত্র সন্তান মেয়ে অন্বেষা বন্দ্যোপাধ্যায় (তোতা) যৌবনে প্রয়াত। খুবই মর্মন্তুদ। কিন্তু এই দম্পতির রাজনৈতিক কার্যকলাপে কোনদিন ছেদ পড়েনি, এখন যেমন স্ত্রীর পড়ছে না।

এই প্রসঙ্গেই এসে যায় কমল গায়েন ও কাকলি গায়েনের কথা। বিশ শতকের সাতের দশক। আধ্যা-ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাস। পূর্বতন অবিভক্ত চব্বিশ পরগণা (বর্তমান দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা) জেলা থেকে যুবক কমল গায়েন আসেন বর্ধমান শহরে জীবিকার সন্ধানে। অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় তখন জেলে। তোতা খুবই ছোট। পরিবারের আর্থিক অবস্থা সঙ্গীন। তবু কমল গায়েনের স্থান হলো এই পরিবারে। শুধু স্থান হলো না, তিনি পরিবারের একজন সদস্য হয়ে গেলেন, হয়ে উঠলেন তোতার 'কাকু'। জীবিকার সন্ধানের পরিবর্তে কমল গায়েন নেমে পড়েন সমাজতন্ত্রের সন্ধানে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র সর্বক্ষণের কর্মী হন এবং পার্টির বর্ধমান জেলা কমিটির সদস্য থাকাকালীন শহিদের মৃত্যু বরণ করেন। ২০১২ সালে তৃণমূল কংগ্রেসী ঘাতকবাহিনী পার্টির আর এক জেলা কমিটির সদস্য কমরেড প্রদীপ তা ও কমরেড কমল গায়েনকে নৃশংসভাবে খুন করে।

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবারে থাকাকালীনই কমল গানেয়ের বিয়ে হয় এবং বিয়ের পরও তাঁরা এই পরিবারেই থেকে যান। কমল গায়েনের স্ত্রী কাকলি গায়েন পার্টি সভ্যা ও এখনও সক্রিয়।

সমবায়ী পরিচয়

১৯৬৮-৮৯ সালে অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীধরপুর কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান ছিলেন। সমবায় পরিচালনায় সেই শুরু। তারপর তার বিস্তার ঘটে সর্বভারতীয় স্তরে, স্বীকৃতি মেলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে। সমবায় সম্পর্কে অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গবেষণাধর্মী বই, 'সমবায় ও মানব সভ্যতা' সমবায়ী ও গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় মার্কসবাদী ছিলেন। তিনি দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে

—এরপর পাঁচেরপাতায়

‘হে সখা মম হৃদয়ে রহ’

মৃদুল সেন

গত ২৯ মার্চ আমার অত্যন্ত কাছের মানুষ, বন্ধু, ভাই, পরম সুহৃদ কমরেড অশোক ব্যানার্জী চলে গেলেন। শুধু কমরেড বললে কথাটা অসম্পূর্ণ হয়—অশোক আমার কাছে তার চেয়েও অনেক বেশি। আমার আর আমার স্ত্রী স্বপ্নার জীবনে অশোক ব্যানার্জী ও গৌরী ব্যানার্জী অনেকটা জায়গা জুড়ে বিরাজমান।

সেই কবেকার কথা। ১৯৬২ সালে আমি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করলাম। কর্মচারীদের এক ছাতার তলায় নিয়ে আসার সংগ্রাম শুরু হল—শুরু হল নানান দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন। যাতে কোনোভাবেই চাকুরিচ্ছেদ না হয়ে যায় তার জন্য প্রয়োজন সংগঠন গড়ার। ১৯৬৪ সালে গঠিত হল বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সমিতি। দেরি না করে কলকাতায় গিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন নিলাম। এবার পাকাপোক্ত ভিতের উপর গড়ে উঠল কর্মচারী সংগঠন।

১৯৬৬ সাল—সারা বাংলা জুড়ে গণআন্দোলনের জোয়ার। সেই ঢেউ উত্তাল তরঙ্গের মতো আছড়ে পড়ল শ্রমিক-কর্মচারী সংগঠনগুলির উপর। গড়ে উঠল ‘১২ই জুলাই কমিটি’—শ্রমিক-কর্মচারী আন্দোলনের যৌথ মঞ্চ।

’৬৬-র ১২ই জুলাই কমিটির মিছিল ভুলবার নয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্মীরা রাস্তায় মিছিলে হাঁটা বা শ্লোগান দেওয়ায় অভ্যস্ত নয়। আমি একাই শ্লোগান। তুললাম—কর্মীরা সাড়া দিল। এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। ধীরে ধীরে সিপিআই(এম) পার্টির নেতারা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে শুরু করলেন। পরিচিত হলাম সুশীল ভট্টাচার্যের সঙ্গে।

এমন সময় ১৯৬৭ সালের মাঝামাঝি একদিন মিছিলে এক নতুন মুখ দেখলাম। ভালো শ্লোগান দেয়। মধুসূদন ব্যানার্জীকে জিজ্ঞেস করলাম—“ছেলেটি কে?” মধুসূদন ব্যানার্জী জানালেন “ওর নাম অশোক ব্যানার্জী—ফিনান্স ডিপার্টমেন্টে নতুন জয়েন করেছে।” মধু ব্যানার্জীকে বললাম—“ওকে ধরুন, ইউনিয়নের কাজে ওকে যুক্ত করতে হবে। বেশ সম্ভাবনাময় ছেলেটি।” সেই প্রথম আলাপ, বন্ধুত্ব এবং পরবর্তীকালে একান্ত আপনজন ও সুহৃদ।

১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়। আমাদের কাজকর্মের পরিধিও আর বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে সীমাবদ্ধ থাকল না। আমি, অমল ব্যানার্জী ও অশোক ব্যানার্জী প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের নানারকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকার কারণে বর্ধমানের সাংস্কৃতিক জগতের সঙ্গে এই ‘ত্রয়ীর’ কিছুটা পরিচিতি ছিল। এই সময় সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে কাজ করার একটা বিশেষ সুযোগ এসে গেল। সলিল ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে ১৯৬৮ সালে অনুষ্ঠিতব্য “ম্যাক্সিম গোর্কী শতবর্ষ” উদ্‌যাপনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে। ১৯৬৭-তে আমার তখনকার বাসস্থান শূলীপুকুর মেসে আমাদের নিয়ে স্বপ্না, মনোরম সেন, আদিত্য ও আরও কয়েকজন পার্টি-ঘনিষ্ঠ ও দরদীদের নিয়ে একটি ছোট্ট আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভাতেই বর্ধমান শহরে একটি প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল—জন্ম নিল ‘অন্বেষা’—শহরের প্রথম গ্রুপ থিয়েটার। এই ‘অন্বেষা’র নামানুসারেই অশোক ব্যানার্জী তাঁর মেয়ের নাম রাখেন অন্বেষা। ১৯৬৮ সালে ‘টাউন হল’ ময়দানে ‘গোর্কী শতবর্ষ’ কমিটির উদ্যোগে সেমিনার, নাটক দিয়ে শতবর্ষ উদ্‌যাপন হল। আমরা মঞ্চস্থ করলাম অমল ব্যানার্জীর পরিচালনায় ‘নীচের মহল’ নাটকটি। মঞ্চ উপস্থাপনায় অসাধারণ সাফল্যে সাধারণ মানুষের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করলাম।

ইতিমধ্যে ১৯৬৭ সালে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের প্রথম সিপিআই(এম) পার্টি শাখা তৈরি হয়। আমরা চারজন। অমল ব্যানার্জী, মধুসূদন ব্যানার্জী, এস.এম. আসগার ও আমি হলাম এর সদস্য। অশোক ব্যানার্জীও ওই বছরেই এই ব্রাঞ্চে যুক্ত হয়—ফলে ওর সাথে আমার বন্ধুত্ব আরও প্রগাঢ় হয়।

এই সময়ে গ্রামাঞ্চলে জমির আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়। যুক্তফ্রন্ট সরকার থাকার কারণে এই লড়াই ভিন্নতর মাত্রা পায়। সাংস্কৃতিক কর্মী হিসাবে আমাদেরও দায়-দায়িত্ব অনেক বৃদ্ধি পেল। কৃষক আন্দোলনের প্রেক্ষিতে রচিত নাটক যেমন ‘রক্তে রোয়া ধান’, ‘জোট বাঁধো তৈরী হও’, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘হারানের নাতজামাই’ প্রভৃতি নাটক ও গণসঙ্গীতের ডালি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম এই সংগ্রামের পাশে। প্রায় প্রতিদিনই কোনো-না-কোনো গ্রাম থেকে বা সম্মেলন থেকে ডাক পেতাম অনুষ্ঠান করার জন্য। ‘হারানের নাতজামাই’ নাটকটি করার সময় ‘ময়না’ চরিত্র করার জন্য মহিলা অভিনেত্রী পাওয়ার একটা সমস্যা দেখা দিল। এই সমস্যার সমাধান করে অশোক ব্যানার্জী ওর স্ত্রী গৌরী ব্যানার্জীকে অভিনয় করার জন্য নিয়ে এসে। ওর মেয়ে তোতা তখন নিতান্তই শিশু। ওকে নিয়েই নিয়মিত রিহার্সালে আসত ওরা দুজন। ঘুমিয়ে পড়ত তোতা। ‘হারানের নাতজামাই’ নাটকটি করার সময় আমরা একবার একটি অসাধারণ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হলাম। কুসুমগ্রামে নাটকটি করতে গেছি—ওইদিনই চৈতন্যপুরের জমিদারদের আন্দোলনরত কৃষকদের উপর গুলি চালানায় কয়েকজন (খুব সম্ভবত ৫ জন) কৃষকের মৃত্যু হয়। পরদিন সারা বাংলা গর্জে ওঠে এই হত্যার প্রতিবাদে এবং হরতাল পালন করে। আমাদের বাসও আর বর্ধমান ফিরতে পারে না—কুড়মুনে এসে আমরা আটকে পড়ি। ওই গ্রামে বসবাসকারী পার্টিনেতা দেবব্রত দত্ত তাঁর বাড়িতে আমাদের নিয়ে গিয়ে থাকার বন্দোবস্ত করেন। বিকেলে আমরা কুড়মুনের কৃষকদের সঙ্গে প্রতিবাদ মিছিলে শামিল হলাম এবং সন্ধ্যায় মিছিল শেষে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত দাওয়ায় বিনা মাইকে ৪টি হ্যাজাকের আলোয় আমাদের নাটক ‘হারানের নাতজামাই’ পরিবেশন করলাম। নাটকটি জনগণের মধ্যে এক অভূতপূর্ব উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিল—পুলিশবেশী আমাকে প্রায় তাড়া করে কয়েকজন। বড়শুলে সারা ভারত কৃষকসভার প্রকাশ্য সমাবেশে এই নাটকটি মঞ্চস্থ করলে কৃষকসভার নেতৃবৃন্দ অভিভূত হয়ে পড়েন এবং বিনয় কোঙারের আনুকূল্যে আমরা কৃষকসভার পক্ষ থেকে একটি দামি হারমোনিয়াম উপহার পেলাম, যেটির অভাব আমাদের দীর্ঘদিন ধরে ছিল।

‘অন্বেষা’র নাটক ও গণসঙ্গীত রিহার্সাল দেওয়ার জন্য প্রয়োজন ছিল একটি ঘরের। টাউন কমিটির সেক্রেটারি সুশীল ভট্টাচার্য টাউন কমিটি অফিসের একটি ঘর আমাদের সংস্থার জন্য নির্দিষ্ট করে দিলেন। শুরু হল গান ও নাটকের নিত্যচর্চা। অনেক সাংস্কৃতিক কর্মী এসে যোগ দিলেন আমাদের সঙ্গে। এলেন অত্যন্ত সুকণ্ঠ ও শক্তিশালী অভিনেতা আনোয়ার হোসেন। রূপমহল সিনেমা ও বর্ধমান সিনেমার মাঝখানের গলিতে ছিল টাউন কমিটির অফিস। প্রতিদিন জমায়েত হতাম রিহার্সাল কক্ষে—মহরা চলত। সুশীলদা অফিস বন্ধ হওয়ার ঠিক আগে আমাদের কয়েকজনকে নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন—এ ছিল এক অভ্যস্ত জীবন।

নাটকের প্রতি অশোক ব্যানার্জীর ছিল অপরিসীম আকর্ষণ। নাটকে অভিনয়ের প্রতিও ছিল অসম্ভব দুর্বলতা। একটি মজার ঘটনার কথা বলি। ‘মারীচ

সংবাদ’ নাটকে ঈশ্বরের স্বর্গীয় পিতার একটি নেপথ্য ডায়ালগ ছিল। অশোক ব্যানার্জী বলল ‘আমি স্টেজে উঠব।’ আমি বললাম—‘কোন অবকাশ নেই।’ নাটকের দিন রবীন্দ্রভবনে নাটক চলাকালীন দেখা গেল এক অভূতপূর্ব দৃশ্য—ঈশ্বরের স্বর্গীয় পিতার ডায়ালগ নেপথ্যে ভেসে ওঠার সময় মঞ্চের ব্র্যাক ড্রপসিনের মাঝখানটা ফাঁক করে অশোক ব্যানার্জীর মুখ দেখা গেল ঈশ্বরের পিতা হিসাবে অবতীর্ণ হতে। যা ছিল নেপথ্যে, ওর কল্যাণে তাই হয়ে উঠল প্রত্যক্ষ। হারানের নাতজামাই নাটকে নাতজামাইয়ের ভূমিকায় অশোক ব্যানার্জীর অভিনয় এক বিশেষ মাত্রা পায় গণআন্দোলনের প্রেক্ষিতে। পুলিশের তাড়া খাওয়া আত্মগোপন করা এক বলিষ্ঠ চরিত্র কৃষকের ভূমিকায় ওর অভিনয় করা চরিত্রের সঙ্গে দর্শকেরা একাত্ম হয়ে যেতেন। পরবর্তীকালে রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান হিসাবে কাজ করার জন্য ব্যস্ত থাকলেও কোনো নাটক আমরা করতে গেলেই শত ব্যস্ততার মধ্যেও অশোক ব্যানার্জী হাজির হতো অংশগ্রহণের জন্য। আমাদের ‘দেনা পাওনা’ নাটকে (যেটির প্রায় ৫০টি প্রদর্শন হয়েছিল) একটি ছোট্ট চাকরের ভূমিকায় অভিনয় করতে সোৎসাহে উপস্থিত হতো এবং স্বাভাবিকভাবেই স্বকীয় অনুনুকরণীয় ভঙ্গিতে সেখানেও দর্শকের মন জয় করে নিত।

এভাবেই সাংস্কৃতিক কাজকর্মের পাশাপাশি আমরা আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়েই এগিয়ে চললাম। যুক্তফ্রন্ট সরকারের শাসনকালে কৃষক-আন্দোলন ও শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রবল গণসংগ্রামে শাসক শ্রেণীর ভিত কেঁপে উঠল। তদানীন্তন যুক্তফ্রন্টের মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায় নিজ সরকারকে ‘অসভ্য-বর্বরদের সরকার’ বলে আখ্যায়িত করলেন। বোঝাই যাচ্ছিল রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি হতে চলেছে। ১৬ মার্চ ১৯৭১ প্রমোদ দাশগুপ্ত ডাক দিলেন ব্রিগেড জমায়েতের—আমরা অশোক ব্যানার্জী সহ কর্মচারী বন্ধুরা মিছিল করে সেই জমায়েতে হাজির ছিলাম। প্রমোদ দাশগুপ্ত নির্দেশ দিলেন পরিষ্কার ভাষায়—“যে মুহূর্তে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হবে সেই মুহূর্তেই এর বিরুদ্ধে রাজ্য অচল করে দিতে হবে।” জারি হল রাষ্ট্রপতি শাসন। সিদ্ধার্থশংকর রায়কে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী পশ্চিমবঙ্গে প্রশাসক হিসাবে নিযুক্ত করলেন। ১৭ মার্চ পশ্চিমবঙ্গব্যাপী হরতাল ডাকা হল, আমরাও সেই হরতালে শামিল হলাম। আমাদের বেশ কয়েকজনকে সাঁইবাড়ি হত্যা মামলায় জড়িয়ে দেওয়া হল। অকিঞ্চন ব্যানার্জীর কোয়ার্টারে আত্মগোপন করে থাকার সময় পার্টির নির্দেশ এল বর্ধমান শহর ত্যাগ করার। আমি অশোক ব্যানার্জীকে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী সমিতির দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে বর্ধমান শহর ত্যাগ করলাম। কিন্তু যারা আমাদের ইউনিয়ন দখল করতে চাইছে তারা থামবে কেন। কিছুদিনের মধ্যেই অশোক ব্যানার্জীকে গুণমণি হত্যা মামলায় জুড়ে দেওয়া হল। ফলে অশোক ব্যানার্জীও বর্ধমান শহর ছেড়ে গ্রামাঞ্চলে গোপন আস্তানায় গিয়ে উঠল, কিন্তু বেশিদিন আত্মগোপন করে ও থাকতে পারল না। কংগ্রেসীদের চক্রান্তে ধরা পড়ে—চলল পুলিশ ও কংগ্রেসী মস্তানদের ওর উপর অমানুষিক অত্যাচার। ওর হাত-পা ভেঙে দেওয়া হল, ব্রিটিশ কায়দায় ঝুলিয়ে দিয়ে পায়ের নীচে আঘাত করে স্নায়ুগুলোকে জর্জরিত করা হল—যা অশোক ব্যানার্জীর শেষ জীবন পর্যন্ত তার শারীরিক অসুস্থতার প্রধান কারণ। এমনকি ওই সময়ে পুলিশী অত্যাচারের ফলে শারীরিক অবস্থার অবনতির কারণে হাসপাতালে পুলিশ প্রহরায় ভর্তি থাকার সময়েও ওকে তুলে নিয়ে গিয়ে খুন করার পরিকল্পনা গুণ্ডারা করে—যদিও পার্টির সতর্কতায় তা সফল হয়নি।

ওই সময়ে আমি কলকাতায় গণশক্তি প্রেসে চলে গেলাম। আমার উপর সাঁইবাড়ি হত্যা মামলার ওয়ারেন্ট থাকা সত্ত্বেও প্রমোদ দাশগুপ্ত ঝুঁকি নিয়েই আমাকে গণশক্তি প্রেসের রোটারী মেশিনের দায়িত্ব দিলেন। একসময়ে অশোক ব্যানার্জী ‘গুণমণি হত্যা মামলায়’ বেকসুর মুক্তি পেল। কাঁধে ঝোলা নিয়ে একদিন হাজির গণশক্তি প্রেসে। আবার যোগাযোগ হল বন্ধুর সাথে। পার্টির কাজ নিয়ে যখনই কলকাতায় আসত আমরা একসঙ্গে বসে পার্টিসংক্রান্ত, বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা, বর্ধমান শহরের অবস্থা এবং সামগ্রিকভাবে তখনকার রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে আলোচনায় কত সময় কাটিয়েছি। আবার ওর মধ্যেই আমরা সিনেমাও দেখেছি। নাটকের প্রতি ওর প্রচণ্ড আকর্ষণ থাকায় থিয়েটারও দেখতে গেছি আমি, অশোক ব্যানার্জী, গৌরী ব্যানার্জী ও স্বপ্না। কলকাতার দমদমে ও আমাদের বাড়িতেও যেত আমার সঙ্গে ওই সময়কালে।

১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থাকালীন ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হলাম—ঠাঁই হলো প্রেসিডেন্সি জেলে। স্বভাবতই অশোক ব্যানার্জীর সঙ্গে যোগাযোগ আবার ছিন্ন হল।

১৯৭৭ সালে জরুরি অবস্থা প্রত্যাহারের পর বিপুল সংখ্যাধিক্য নিয়ে বামফ্রন্ট ফিরে এলে আমিও বর্ধমানে ফিরে এলাম। কলকাতায় যেদিন বামফ্রন্ট সরকার শপথ গ্রহণ করে সেদিনটিতেই আমি ও অশোক ব্যানার্জী আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করতে এলাম। কর্মচারীদের বিপুল উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সমস্ত ভয়-ভীতি কাটিয়ে তারা সাদর অভ্যর্থনা জানালো আমাদের। আবার আমরা কর্মচারী সংগঠনকে শক্তিশালী করার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। কর্মচারী আন্দোলনে এল নতুন জোয়ার। বিশ্ববিদ্যালয়কে দুর্নীতিমুক্ত করাই ছিল আমাদের লক্ষ্য। কিন্তু অশোক ব্যানার্জী বেশিদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকল না। দ্বিতীয় বামফ্রন্টের আমলে রামনারায়ণ গোস্বামী রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের মন্ত্রী হলে উনি অশোক ব্যানার্জীকে তাঁর ব্যক্তিগত সচিব হিসাবে নিয়োগ করলেন।

ইতোমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিউ এ্যাক্ট হিসাবে কোর্ট নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু হল। কোর্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য অশোক ব্যানার্জীকে ফিরিয়ে আনা হল। বিপুল ভোটে জয়লাভ করে অশোক ব্যানার্জী। আমিও জয়লাভ করি এবং জেলা সম্পাদক রবীন সেন-এর নির্দেশে কাউন্সিল সদস্য হিসাবে আমাকেই মনোনীত করা হল। আবারও অশোক ব্যানার্জী খুব বেশিদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকল না।

এক সময় অশোক আমাকে জানায় যে পার্টি পূর্বতন সাপ্তাহিক ‘নতুন পত্রিকা’ আবার নবকলেবরে ‘নতুন চিঠি’ নাম নিয়ে প্রকাশ করতে চলেছে এবং তার দায়িত্বে থাকবে অশোক ব্যানার্জী। গণশক্তি পত্রিকা ও প্রেসে আমার কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকায় ও আমাকে অনুরোধ করে আমি যেন পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটির প্রকাশে ওকে সর্বতোভাবে সাহায্য করি—বন্ধুর অনুরোধ রাখলাম এবং বেশ কিছুদিন ওই পত্রিকার সাথে যুক্ত ছিলাম।

এর পরেই অশোক ব্যানার্জী সমবায় আন্দোলনের একজন অগ্রণী পথিক ও নেতা হিসাবে সমবায় আন্দোলনের ক্ষেত্রে তার কর্মক্ষেত্রকে প্রসারিত করে। সারা দেশেই সমবায় আন্দোলনের একজন অগ্রগণ্য নেতা হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান হিসাবে নিযুক্ত হয় অশোক ব্যানার্জী। সর্বভারতীয় সমবায় আন্দোলনে অশোক ব্যানার্জী সর্বশ্রেষ্ঠ সমবায়ী ব্যক্তি ও সংগঠক হিসাবে স্বর্ণপদক লাভ করে যা আমাকে বন্ধু হিসাবে গর্বিত করে। মনে পড়ে আমার সপরিবারে কেরালা ভ্রমণের সময়ও ত্রিবান্দ্রমে আমাদের থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা করার অনুরোধ করে ওখানকার সমবায় কর্তাদের। রেলওয়ে স্টেশনে ওইসব কর্মকর্তারা উপস্থিত হয়ে আমাদের সাদরে কো-অপারেটিভ গেস্টহাউসে নিয়ে যান এবং আমাদের থাকা-খাওয়ার এলাহি ব্যবস্থা করেন। ওই সময় দেখেছি কেরালার সমবায়ী কর্তারা অশোক ব্যানার্জী সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত এবং সমবায় আন্দোলনে তাঁর ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন। এর থেকেই বোঝা যায় সর্বভারতীয় সমবায় আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে ওর অসামান্য ভূমিকা ও জনপ্রিয়তা।

অশোক ব্যানার্জীর রাজনৈতিক জীবন নিয়ে অনেকেই লিখেছেন—আমি সে প্রসঙ্গে যাচ্ছি না। আমাদের দুটি পরিবারের মধ্যে যে গভীর বন্ধুত্ব তা কখনোই ভুলতে পারবো না। মনে পড়ে ওর মেয়ে তোতার প্রথমবার বিয়ে নিয়ে কথা বলতে অশোক ব্যানার্জী ও গৌরী ব্যানার্জী আমাদের বাড়িতে আসে। তখন আমি এই বিয়েতে সায় দিতে পারিনি। অন্য সম্প্রদায় বা ধর্মের কারণে নয়, ছেলেটির ব্যক্তিগত জীবনশৈলী বিষয়ে অনেক খবর জানি বলেই আমি অশোক ব্যানার্জীকে বলেছিলাম এ বিয়েতে তোতা সুখী হতে পারবে না বলেই আমার ধারণা। সেদিন আমি গৌরী

—এরপর ছয়ের পাতায়

কমরেড অশোক ব্যানার্জী—কমিউনিস্ট মূল্যবোধে লালিত এক সংগ্রামী জীবন

সেখ সাইদুল হক

২৯ মার্চ ২০০২০ বেলা ১১.৩০ নাগাদ সিপিআই(এম)-এর জেলা অফিস হতে ফোনে জানলাম আমাদের প্রিয় অশোকদা, কমরেড অশোক ব্যানার্জী আর নেই। মানসিক প্রস্তুতি ছিল। গত ২১ মার্চ গিয়েছিলাম ওনাকে দেখতে। তখনই খুব অসুস্থ। ওনার সহযোদ্ধা ও সহধর্মিণী গৌরীদি ছিলেন। কথা হল। শেষ কয়েকবছর নানা রোগে ভুগছিলেন। তবু নিয়মিত পার্টি কর্মসূচিগুলিতে থাকার চেষ্টা করেছেন। অবশেষে ৮৩ বছর বয়সে নার্সিংহোমেই প্রয়াত হলেন। এক দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনের অবসান হল। মৃত্যুর খবর শুনেই নার্সিং হোমে পৌঁছে গেলাম। করোনা সতর্কতা ও লকডাউন বিধি মেনে মরদেহ জেলা অফিসে আনা হল। সেখান হতে মেডিকেল কলেজে দেহ দান।

অশোকদা মানেই সংগ্রামের অনুপ্রেরণা। পার্টির মধ্যে এমন বেশ কিছু মানুষ আছেন যাঁদের দেখে শ্রদ্ধায় মাথা অবনত হয়। এই কারণে নয় যে তাঁরা মার্কসবাদে সুপণ্ডিত বা উচ্চ ডিগ্রিধারী কিংবা পার্টির বা প্রশাসনের উচ্চপদে আছেন। হয় এই কারণে যে তাঁদের আদর্শনিষ্ঠা, ত্যাগ তিতিক্ষা, সরল অনাড়ম্বর জীবন, কমিউনিস্ট মূল্যবোধ তাঁদেরকে নেতা হিসাবে নয়, পার্টির পরিধির বাইরেও মানুষজনের কাছে আপনজন করে তোলে। অশোকদা কমরেড অশোক ব্যানার্জী, তেমনই একজন।

কৃষক ও গণ আন্দোলনের ধারায় :

শুধু রাজ্যে নয় সারা দেশে সমবায় আন্দোলন ও স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠনে অশোক ব্যানার্জী একটি অতি পরিচিত নাম। কিন্তু সমবায় আন্দোলনে সাফল্য ও সার্থকতায় পৌঁছে দেবার ক্ষেত্রে কৃষক আন্দোলন ও গণআন্দোলনে তাঁর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ যে গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক উপাদান হিসাবে কাজ করেছে সেটাকে সর্বাগ্রে বিবেচনায় রাখতে হবে। আর এখানেই অশোকদার সার্থকতা ও প্রাসঙ্গিকতা। প্রাদেশিক কৃষকসভা, জেলা কৃষকসভার সদস্য হিসাবে অশোকদা যোগ্যতার সাথে সে কাজ করে গেছেন।

১৯৩৮ সালে কালনাতে জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর পিতা বাসা বাঁধেন মেমারি-২-এর শ্রীধরপুরে। সেখানে প্রাথমিক পড়াশুনা। পরে ভাতার স্কুলে, তারপর সিউড়ি কলেজ এবং পরে রাজ কলেজে পড়াশুনা সাঙ্গ করে ১৯৬০-এর দশকের শুরুতে বর্ধমান শহর লাগোয়া সদরের রায়ান হাইস্কুলে শিক্ষকতা। ১৯৬৪ সালে গৌরীদি-র সাথে বিয়ে। গলসী গার্লস হাইস্কুলের দিদিমণি। শহরের পারাপুকুরে তাঁরা ভাড়াবাড়িতে থাকতেন। ওই সময়ই ১৯৬৫ সালের খাদ্য আন্দোলনে, শিক্ষক আন্দোলনে নিজেকে যুক্ত করেন রায়ানের প্রিয় মাস্টারমশায় অশোকদা। নজরে পড়েন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের অন্যতম সৈনিক এবং সেই সময়ের বর্ধমানের কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতা কমরেড সুবোধ চৌধুরীর। অশোকদা রায়ান হাইস্কুলের চাকরি ছেড়ে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী রূপে যোগ দেন এবং ১৯৬৭ সালে পার্টি সদস্যপদ লাভ করেন। ১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়েছে। কমরেড হরেকৃষ্ণ কোঙারের আহ্বানে খাস জমি, বেনামি জমি দখলের আন্দোলনে গোটা বাংলা আলোড়িত। কমরেড অশোকদাও শহর লাগোয়া সদরের গ্রামগুলিতে, বিশেষ করে সরাইটিকর অঞ্চলে এবং পরে রায়ান মীর্জাপুর অঞ্চলে জমির আন্দোলনে সরাসরি যুক্ত হলেন। ১৯৬৯ সালে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে দেবার পর দখলীকৃত জমি যাতে জোতদাররা কেড়ে নিতে না পারে তার জন্য প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলেন ঐ এলাকায়। তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা হয়। সেই সময় মীর্জাপুরের অবনী দত্ত রেল কর্মচারী আন্দোলনের নেতা ছিলেন। তাঁর এক ভাই ছিলেন প্রাথমিক শিক্ষক। হটুদেওয়ানে থাকতেন। সেই বাড়িতে অশোকদা কিছুদিন আত্মগোপনে থেকে রায়ানে জমির আন্দোলনে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। ওই অবস্থায় ১৯৭১ সালে কংগ্রেসী গুণ্ডা ও পুলিশ বাহিনীর তাড়া খেয়ে রায়ানের মাঠে তিনি ধরা পড়েন। রায়ান গ্রামের কেষ্ট চ্যাটার্জী ও পূর্ণ মালিকও ওই আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। অশোকদা ধরা পড়লে পুলিশ ও গুণ্ডাবাহিনী তাঁকে প্রচণ্ড মারধোর করে। হাত পা ভেঙে দেয়। ওই অবস্থায় তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়। ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বরে মুক্তি পান। তিনি মুক্তি পেলেও আধা ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাসের জন্য এলাকায় থাকতে পারেননি। আত্মগোপন করতে বাধ্য হন। বর্ধমান জেলা কৃষকসভার উদ্যোগে নতুন চিঠির প্রকাশনায় জ্যোতির্ময় স্যারের সম্পাদনায় কৃষকসভার ৬০ বছর উপলক্ষে যে প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশিত হয় সেখানে রামনারায়ণ গোস্বামীর জমির আন্দোলনের উল্লেখ আছে।

১৯৭৭ সালে জরুরি অবস্থার অবসান ঘটলে এবং বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হলে তিনি আবার প্রকাশ্যে পার্টির কাজ শুরু করেন। কমরেড বিনয় চৌধুরী এবং কমরেড বিনয় কোঙারের পরামর্শে কৃষক আন্দোলনকে পরিপুষ্ট করার লক্ষ্যে সমবায় আন্দোলন বিকাশে মনোনিবেশ করেন।

সমবায় আন্দোলনের ময়দানে :

অশোকদার সমবায় আন্দোলন গড়ে তোলার হাতেখড়ি হয় তাঁর পিতার প্রতিষ্ঠিত শ্রীধরপুর প্রাইমারি কো-অপারেটিভ সোসাইটিতে। যাতে ওই সমবায় সমিতি প্রকৃত অর্থে কৃষকের বন্ধু হিসাবে দাঁড়াতে পারে, তাদেরকে অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী করতে পারে তার জন্য তিনি ওই সমবায়ে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা চালু করেন। আলু-প্রধান এই এলাকায় কৃষকের স্বার্থে ওই সমবায়ের অধীনে হিমঘর গড়ে তোলেন। পরে তাঁর কাজের পরিধি জেলা জুড়ে বিস্তৃত হয় যখন তিনি ১৯৮৫ সালে বর্ধমান সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ভাইস চেয়ারম্যান হন। কমরেড রামনারায়ণদা স্বাস্থ্য দপ্তরের মন্ত্রী হলে তিনি কিছু দিন তাঁর আপ্ত সহায়কের ভূমিকা পালন করেন। তারপর আবার সমবায় আন্দোলনের বিকাশে ও স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠনে রাজ্য জুড়ে নেতৃত্ব দিতে থাকেন। এর আগেই তিনি ১৯৮১ সালে জেলা পার্টির সদস্য হন। এবং পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি ছেড়ে দেন। নিজেকে কৃষক ও সমবায় আন্দোলনের কাজে নিয়োজিত করেন। পশ্চিমবঙ্গে সমবায়ে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠন অথাৎ সমবায়ের মধ্যে সমবায় গঠন এবং ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্পের সূচনা তাঁরই ভাবনাপ্রসূত। রাজ্যে গ্রামীণ কৃষি সমবায়ের সদস্যপদের জন্য সার্বজনীন সদস্যপদের ধারণা তিনি নিয়ে এসে তা কার্যকরী করেন। সমবায় আন্দোলনের সূত্রে ১৯৯৭ সালে তিনি শ্রেষ্ঠ সমবায়ী মনোনীত হন এবং পুরস্কার স্বরূপ প্রাপ্য ৫০ হাজার টাকা সমবায় আন্দোলনের বিকাশে দান করেন। এরপর তিনি রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান, পশ্চিমবঙ্গ অর্থ নিগমের চেয়ারম্যান, পশ্চিমবঙ্গ পরিকাঠামো উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান পদ অলংকৃত করেন। সমবায়ের ক্ষেত্রে তাঁর কাজের স্বীকৃতিতে ভারত সরকারের বিখ্যাত ইফকো সংস্থা তাঁকে 'সমবায়রত্ন' উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁর কাজের জন্য তিনি এশিয়ার কো-অপারেটিভ ইউনিয়নের সচিব পদ লাভ করেন। ভারত সরকার ফিনান্সিয়াল কো-অপারেটিভ ব্যবস্থা গড়ার জন্য যে বৈদ্যনাথন কমিটি গঠন করে তিনি তাঁর অন্যতম সদস্য ছিলেন। সর্বভারতীয় স্তরে যে ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কস লিমিটেড আছে তারও তিনি চেয়ারম্যান হয়েছিলেন। ২০০৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে সমবায় সমিতি আইন সংস্কার করে সেখানেও তিনি সদস্য হয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। ২০১১ সালে পরিবর্তনের সরকারের আমলে যেভাবে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীগুলি শুকিয়ে যাচ্ছিল, যেভাবে সমবায় সমিতিগুলি দুর্নীতিতে ভরে যাচ্ছিল বা উঠে যাচ্ছিল তাতে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে কৃষক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের সাথে পরামর্শ করে তাঁদের সাথে সমবায় বাঁচাও আন্দোলন গড়ে তুলতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। ২০১২ সালে গঠিত ওই মঞ্চের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং প্রথম সাংগনিক

কমিটির আহ্বায়ক নিযুক্ত হন।

সমবায় আন্দোলনের বিকাশে বর্ধমান জেলার কৃষক আন্দোলনের নেতৃত্ব সংকল্প পিপলস ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি গঠন করে। এখানেও অশোকদা একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। বর্ধমানের 'জাগরী' ভবনে অবস্থিত এই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন তাঁরই নেতৃত্বে নাবার্ডের সহযোগিতায় সালানপুর ব্লকে জল বিভাজিকা প্রকল্প, বর্ধমান সদরের সাধনপুরে বায়োটেক ভবন নির্মাণ করে, যেখানে 'নাইট্রোফক্স' নামে জীবাণুসার তৈরি করা হয়। তিনি জৈব সারের ব্যবহার এবং 'শ্রী পদ্ধতি'তে ধান চাষে জোর দেন। তাঁরই উদ্যোগে কাঁকসা এলাকায় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'বিকল্প'কে সাথী করে 'সংকল্প' সংস্থা কাঁকসার রঘুনাথপুরে রুরাল টেকনোলজি প্রকল্প তৈরি করে, যেখানে ভেষজ আবীরের রঙ, মিহিদানার রঙ তৈরি করা হতো। পরিবর্তনের এই জামানায় তা এখন ভেঙে পড়েছে। মেমারি-২ ব্লকের সাতগাছিয়ার গ্রামবাসীদের দ্বারা গ্রাম পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে তিনি সেখানে শ্রীধরপুর সমবায়কে কেন্দ্র করে সর্বাত্মক গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা করেন, সেখানে একদিকে বীজ-গ্রাম গঠন করেন, পাশাপাশি ওই এলাকার কৃষক খেতমজুরদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ওপর জোর দেন। সমবায় আন্দোলনকে এবং স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠনের আন্দোলনকে বিকশিত করার সাথে সাথে জেলার গণআন্দোলন পরিচালনাতেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। এই কাজে তাঁকে অনেকেই সাহায্য সহযোগিতা করেন। তবে দুজনের কথা উল্লেখ করতেই হয়। একজন শহিদ কমরেড কমল গায়েন এবং অপরজন তাঁর সহযোদ্ধা ও সহধর্মিণী কমরেড গৌরী ব্যানার্জী। ১৯৬৪ সালে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হবার পর গৌরীদি শিক্ষকতার পাশাপাশি নাটক, যাত্রা, এসবে যুক্ত ছিলেন। তারপর যুক্ত হন মহিলা আন্দোলনে। ১৯৭১ সালে পার্টি সদস্য হন। দুজনেই বহু আক্রমণের শিকার হয়েছেন। তথাপি তাঁদের মনোবল ভাঙেনি। ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে গৌরীদি অশোকদার যোগ্য সহযোদ্ধার ভূমিকা পালন করেছেন। আজও তিনি পার্টির জেলা কমিটির সদস্যা।

মানুষ হিসাবে :

আজীবন কমিউনিস্ট আদর্শে লালিত অশোকদা মানুষ হিসাবে কেমন ছিলেন এই প্রশ্নের একটাই উত্তর পেতে পারে, যেমন একজন কমিউনিস্টের হওয়া উচিত। কিন্তু সে প্রশ্নে না গিয়েও এটা বলা যায় অশোকদার মধ্যে যেটা দেখেছি তা হলো ইজি অ্যাপ্রোচ। অর্থাৎ যে-কোনো সময় কাছে গিয়ে প্রাসঙ্গিক–অপ্রাসঙ্গিক দুচার কথা বলা যায়। তিনি মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। তবে এমন নয় শুনে চুপচাপ গুম হয়ে বসে থাকতেন। দুচারটা মতামতও দিতেন। কোনো কাজ পছন্দ না হলে যেমন সাংগঠনিক সভার মিটিং-এ বলতেন, তেমনি ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় তা উল্লেখ করে নিজেকে বোঝার চেষ্টা করতেন। কোনো বিষয়ে ত্রুটি হয়েছে বুঝলে অকপটে তা স্বীকার করতেন। মুখের উপর স্পষ্ট বলার অভ্যাস তাঁর ছিল। শুনেছি জ্যোতিবাবু তাঁকে আবাসন বোর্ডের দায়িত্ব নিতে বললে তিনি জ্যোতিবাবুর সামনেই বলেছিলেন, একটা শর্ত যদি মানেন তবেই দায়িত্ব নেব। শর্ত ছিল চেয়ারম্যানের কোনো কোটা থাকবে না। জ্যোতিবাবু মেনে নিয়েছিলেন। সমবায় প্রশাসন এত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন কিন্তু কেউ কোনদিন তাঁর দিকে অভিযোগের আঙুল তুলতে পারেননি। মানুষ হিসাবে তাঁর আরও যে গুণ ছিল তা হল কলকাতায় চিকিৎসার ব্যাপারে কোনো কমরেড সাহায্য চাইলে তিনি সাধ্যমতো চেষ্টা করতেন। বাড়িতে দেখা করতে গেলে খুবই আন্তরিকতা দেখাতেন।

আমাদের গলসীতে গৌরীদির শিক্ষকতার সূত্রে অশোকদারা এক-দেড় বছর বাস করেছিলেন। কিন্তু সাংগঠনিক কাজে যুক্ত ছিলেন না। তাই তাঁর সাথে আমার ব্যক্তিগত পরিচিতি থাকলেও কাজের সুযোগ সেভাবে ছিল না। বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান হিসাবে এবং পরে সাংসদ হিসাবে কাজ করার সময় আমার কাজের পরিধি একটু বিস্তৃত ছিল। ওই সময় ওনার একই ওয়ার্ডে (২ নং ওয়ার্ড) বর্ধমান শহরে আমি ২০০০ সাল থেকে বসবাস শুরু করলাম, তখন তাঁর সঙ্গে আরও বেশি ঘনিষ্ঠ হবার কিছু সুযোগ পেলাম। টুকরো সেই স্মৃতিগুলিই এখন ভেসে উঠছে।

টুকরো কিছু স্মৃতি :

আমি ও শিবুদা (শিবশংকর কোঙার) সকালে গোলাপবাগ পর্যন্ত হাঁটতে যাই। অশোকদাও মাঝে মধ্যেই ছড়ি হাতে যেতেন। একদিন ধরে বললেন নতুন চিঠিকে বাঁচাতে হবে, প্রচার বাড়াতে হবে। কিছু অর্থ তুলতে হবে। নিজেও কিছু অর্থ দিয়েছিলেন। নতুন চিঠি-র প্রতি অশোকদার আলাদা আবেগ ছিল। ১৯৭৭ সাল হতে এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন। তারপর প্রকাশক। আমার লেখার ব্যাপারে সাধারণভাবে দিনেশ বলে। কোন কোন বিষয়ে অশোকদাও বলতেন। আমি খুব গর্বিত যে, ২০১৭ সালে নতুন চিঠির প্রকাশনায় শিক্ষার ওপর আমার যে বইটি (শিক্ষার চালচিত্র : ভাবনা ও দুর্ভবনা) প্রকাশিত হয় তার প্রকাশক ছিলেন অশোকদা। নতুন চিঠি প্রকাশনা হতেও অশোকদার দুটি উল্লেখযোগ্য পুস্তক প্রকাশিত হয়। একটি হল 'স্বনির্ভরতার সন্ধানে' অপরটি হল 'সমবায় ও স্বনির্ভরতা'।

নির্বাচনী সংগঠন পরিচালনার বিষয়ে অশোকদা খুব যত্নশীল ছিলেন এবং হাতে কলমে কাজ করতেন। ২০০৯ সালে তখন আমি লোকসভার প্রার্থী। মন্তেশ্বরের মাঝেরগ্রাম পার্টি অফিসে তিন-চার রাত থাকতে হয়েছিল। দেখলাম অশোকদাও নির্বাচনী প্রচারে ওখানে আছেন। বুথ ধরে ধরে বিশ্লেষণ করে বলে দিতেন কোথায় কী অবস্থা। কী করা দরকার। ওখানকার কয়েকটি গ্রামে আমরা দুর্বল ছিলাম। উনি কমরেডদের বলতেন, তোমরা যাও তালাই পেতে বসে থাকে। একদিন না একদিন দু-চারজন করে ঠিকই আসবে।

বর্ধমানের জাগরীতে গত বছর সাক্ষরতা প্রসার সমিতির উদ্যোগে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর উপর রাজ্য কর্মশালা হলো। অশোকদা অসুস্থ শরীরে সারাদিন রইলেন। প্রতিনিধিদের বক্তব্য শুনলেন। সমবায় বাঁচাও আন্দোলনে জেলাগুলিতে যারা কাজ করছেন তাঁদের অনেককে চিনতেন। তাঁদের খোঁজ খবর নিলেন। তারপর প্রায় দেড় ঘন্টা স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীগুলিকে দেখভালের ক্ষেত্রে সাক্ষরতা কর্মীদের কী কাজ হওয়া উচিত সে বিষয়ে মনোজ্ঞ বক্তব্য রাখলেন।

কলকাতায় বা জেলার বাইরে কাজের সূত্রে তিনি প্রায় থাকতেন। কিন্তু বাড়ির প্রতি উদাসীন ছিলেন না। কমল গায়েন ও তাঁর স্ত্রী কাকলি গায়েনকে পরিবারের একজন হিসাবে রেখে দিয়েছিলেন। কমলদা শহিদ হবার পরও কাকলিদি ওদের কাছেই থাকতেন পরিবারের একজন হয়ে। একমাত্র মেয়ে তোতার (অন্বেষা ব্যানার্জী) মৃত্যু অশোকদাকে খুব দুঃখ দিয়েছিল। তোতার স্মৃতিতে অন্বেষা সাংস্কৃতিক সংস্থা গড়ে ওঠে। মূলত দেবেশ ঠাকুরদের উদ্যোগে বার্ষিক অনুষ্ঠান হতো। আমাকেও আমন্ত্রণ করতেন। যেতাম। ওদিন অশোকদা অনেকটা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়তেন। আবার সামলে নিতেন। আসলে ওনার একটি দরদি মন ছিল। লোকসভা নির্বাচনের আগে শ্রীধরপুরে তাপসরা একটা জনসভা ডাকল। আমি বক্তা। অশোকদাও সাথী হলেন। ওখানেই তো বাড়ি। গাড়িতে নানান বিষয়ে বললেন। কীভাবে কাজ করতে হবে, জনসংযোগ বাড়াতে হবে, নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার কথা বললেন। শহিদ শিবশংকর চৌধুরীর কথা বলতে বলতে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়তেন। মৃত্যুর কয়েক মাস আগে বাড়ি বিক্রির টাকা হতে বেশ কিছু টাকা সেবাসদনে দান করে গেলেন যন্ত্রপাতি কেনার জন্য।

২০১১-এর পরিবর্তনের জামানার পর বেশ কয়েকবার আক্রান্ত হয়েছেন। বেশ কয়েকবার অসুস্থও হয়েছেন। দেখতে গেছি। দেখেছি মনোবলে এতটুকু চিড় ধরেনি। সাম্প্রতিক সময়ে সাংগঠনিক কাজের ধারার পরিবর্তন, নেতৃত্বেরও নিজেদেরকে সেই মতো পরিবর্তন করার বিষয়ে কিছু কিছু মতামত দিতেন। তখন এগুলিকে হয়তো অর্থোডক্স বা পিউরিট্যান মনে হতো। কিন্তু পরে বুঝেছি গভীর উপলব্ধি হতে ও অতীতের বাস্তব শিক্ষা হতে এগুলি বলতেন। অশোকদা এখন আর নেই। কিন্তু তিনি বেঁচে থাকবেন আমাদের মাঝে, আমাদের কাজের ধারায়, আমাদের ভাবনায়, চিন্তায়। কমিউনিস্ট আদর্শবোধে লালিত তাঁর সংগ্রামী জীবন আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে যাবে। তাঁর লেখা গ্রন্থ 'সমবায় ও মানব সভ্যতা' ভবিষ্যত প্রজন্মের সমবায় আন্দোলনকারীদের কাছে, গবেষকদের কাছে একটি দলিল হয়ে থাকবে। কমরেড অশোক ব্যানার্জী অমর রহে।

অশোকদাকে মনে রেখে

জহর মুখোপাধ্যায়

অশোকদা সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে ঠিক কীভাবে শুরু করা যায়? প্রায় চারদশক ধরে অশোক বন্দ্যোপাধায়ের সান্নিধ্য পেয়েছি, তবু শ্রদ্ধামিশ্রিত দূরত্ব একটা থাকতই। তিনি ছিলেন যে কথা, ঠিক তখনই সেই কাজের মানুষ। তাই অবাক হয়ে দেখলাম, কাজটি তিনি করেই ছাড়লেন। যদিও এবার কোনো কথা বলার সুযোগ ছিল না। লক্-ডাউনের মধ্যেই কোনও নিষেধাজ্ঞার তোয়াক্কা না করে চলে গেলেন ২৯ মার্চ সকালের শেষ বেলায়। শেষ সময়ে তাঁকে দেখতে না পারার আফশোস নিয়ে ভেবেছি, কিছুদিন আগেই তো তিনি ডিপ্লোম্যাট নার্সিংহোমে অসুস্থ হয়ে ভর্তি ছিলেন। দেখতে গেছি, তখনও তাঁর মস্তিস্ক প্রখর। আমায় দেখে বললেন কেন আমি খোঁড়া পায়ে উপরে উঠে দেখতে গেছি। তারপর বাড়ি ফিরলেন। এবার ভর্তি হবার পরও তিনি ফিরেই আসবেন ভেবেছিলাম। কিন্তু এবার অন্যথা হল। নিবেদিতপ্রাণ এক সংগ্রামী জীবন শেষ হল। জেলার সমবায় আন্দোলনে আমরা অভিভাবকহীন হলাম। কিছুদিন আগেই তাঁর উত্তরসূরী বিশিষ্ট সমবায়ী চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরা হারিয়েছি। এ শূন্যতা আমাদেরই পূরণ করতে হবে।

অশোকদার সরল সাদামাটা জীবনযাপন, নিরলস কর্মোদ্যোগ ও শৃঙ্খলাপরায়ণতা সম্পর্কে আমরা বর্ধমানবাসীরা সবাই জানি। এও জানি নানা অসুস্থতার মধ্যে নিজেকে কীভাবে সচল-স্বাভাবিক রাখতে পারতেন। সুশৃঙ্খলভাবে চিকিৎসকদের সতর্কবার্তা ও পরামর্শ মেনে চলতেন। জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে গেছেন। কৃষক আন্দোলন, শিক্ষকতা ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী আন্দোলন থেকে শেষে সমর্পিতপ্রাণ সমবায়ী এবং মানুষকে সাথে নিয়ে প্রকৃত সমবায় আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে রাজ্য ও দেশের পুরোধা ব্যক্তিত্ব। নির্যাতন ও কারাবরণ সহ্য করেও একই সাথে ধারাবাহিকভাবে গণআন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত থেকেছেন। আবার আটপৌরে পাজামা-পাঞ্জাবিতে ও সাধারণ জীবনাচরণে সমাজের উপরতলার মানুষদের মধ্যেও প্রয়োজনে তাঁর প্রত্যয় ঘোষণা করে গেছেন। সমবায় ও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, নাবার্ড কিংবা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রথী-মহারথীদের দেখেছি তাঁর সাথে শ্রদ্ধাশীল আলাপচারিতায়। অশোকদা তাঁদের কাছে নিজস্ব মতামত দৃঢ়তার সাথে উপস্থাপনার্থে কখনো দ্বিধাবোধ করতেন না। জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কগুরির সম্মেলনে উপস্থিত

আমলারাও লক্ষ করতেন কীভাবে সভাপতি হিসাবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আলোচ্যসূচির সবকটি বিষয়ের উপর আলোচনা আহ্বান করতেন এবং যুক্তিগ্রাহ্য জবাব দিতেন। শুধু তাই নয়, একবার পুরুলিয়ায় অনুষ্ঠিত সভায় একজন পদাধিকারী একটি বিষয়ে আপত্তি জানান—অশোকদা তৎক্ষণাৎ তাঁকে একটি দিন স্থির করে জানাতে বলেন—এবং নিজে পুরুলিয়ায় সেই গণ্ডগ্রামে উপস্থিত থাকবেন ও সবটা দেখবেন আশ্বাস দেন। একেবারে নীচে নেমে কাজ করার এরকম অনন্য নজির স্থাপন করে গেছেন। আউশগ্রামের জঙ্গলমহল এলাকায় প্রাথমিক কৃষি সমবায়ে তাঁর সাথে একটি সভায় গিয়ে দেখেছি, সেখানকার আদিবাসী মানুষগুলির সাথে মহিলারাও সভা শুরুর আগে তাঁর সঙ্গে কথা বলার জন্য ঘিরে ধরেছেন। প্রকৃত সমবায় যাঁদের জন্য সেই গ্রামের সাধারণ মানুষদের সাথে অশোকদার আত্মীয়তা, বহুদিনের অক্লান্ত অবদানের মধ্য দিয়েই অর্জিত হয়েছিল।

তিনি ১৯৮৫ সালে বর্ধমান জেলা সমবায় ব্যাঙ্কের সহ-সভাপতি থেকে রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের সভাপতি ছাড়াও সমবায় সংগঠনের রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্তরে নানা পদে দায়িত্ব সামলেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারি মঞ্চ থেকে 'সমবায়রত্ন' খেতাব অর্জন করেন ও সেই সাথে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার পান। ওই সভামঞ্চেই তিনি ওই টাকা সমবায় আন্দোলনের স্বার্থে দান করার কথা ঘোষণা করেন। অশোকদার কাছ থেকেই শোনা, তাঁর এই ঘোষণা শুনে সবাই বিস্মিত হয়েছিলেন। এর আগে কেউ এমনটা করেননি। এও এক অনন্য নজির তিনি রেখে গেছেন। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে গঠিত সমবায় সংক্রান্ত বিভিন্ন কমিশনে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং ওয়েস্টবেঙ্গল ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশন ও ওয়েস্টবেঙ্গল ইনফ্রাস্ট্রাক্চার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার যখন আর্থিক সমবায় সংস্থাগুলির পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে 'বৈদ্যনাথন কমিশন' গঠন করে, তৎকালীন নাবার্ড-কর্তা ডাঃ ওয়াই.এস.পি থোরাট অশোকদাকে এই কমিশনে যুক্ত হতে বলেন। প্রথমে রাজি না হলেও অনেকের অনুরোধ-উপরোধে তিনি যুক্ত হন ও যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। সমবায় সংগঠনের সর্বোচ্চ স্তরে আসীন থেকেও একেবারে মাটির থেকে সমবায় আন্দোলন গড়ে তোলার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও পাশাপাশি লাগাতার গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যুক্ত থাকার সুবাদে তিনি লিখতে পেরেছেন সমবায় বিষয়ে কোষ-গ্রন্থটি—'সমবায় ও মানবসভ্যতা'।

এ রাজ্যে ২০১১ সালে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর অশোকদাকে কঠিন লড়াইয়ের মুখোমুখি হতে হয়। বিভিন্ন স্তরে তাঁকে সংগ্রাম চালাতে হয়েছে। এবং নানাভাবে কুৎসা ও অপপ্রচারের শিকার হয়েছেন। আমরা কষ্ট পেয়েছি ও প্রতিবাদ করেছি। কিন্তু তিনি অবিচল থেকে লড়াই চালিয়ে গেছেন অবিরাম। তাঁর সঙ্গে আমাদের শেষ কর্মসূচি রাজ্য সমবায় বাঁচাও মঞ্চের প্রতিষ্ঠাদিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান বর্ধমানে 'জাগরী'-তে। শরীর বাদ না সাধলে তিনি প্রায় সব কর্মসূচিতেই হাজির থাকতেন। অত্যন্ত কষ্ট করে, পার্কাস রোডে প্রভাত কুণ্ডু ভবনে চারতলায় উঠেও সভায় উপস্থিত থেকে সময়োপযোগী পরামর্শ দিয়েছেন। কোনো কর্মসূচি না থাকলে 'নতুন চিঠি' অফিসে নিয়মিত যেতেন।

অশোকদার সঙ্গে কতবার মতান্তর হয়েছে, আবার তিনিই কাছে টেনে নিয়েছেন। কখনো কিছু মনে রাখেননি। এইরকম এক সংগ্রামীর জীবনাবসানে অনেক স্মৃতি ভিড় করে আসে। তাঁর সকল অবদান স্মরণ করে, চলমান জীবন-প্রবাহে আমাদের 'তরণী বাওয়া'-কে তাঁর শরণ নিতেই হবে। সমবায়ের সাতরঙা পতাকার প্রকৃত প্রাণময়-স্বপ্নময় প্রতিনিধি অশোকদাকে জানাই লাল সেলাম।

পুনশ্চ : তাঁর জীবনসঙ্গিনী গৌরীদির কথা বাদ দিই কেমন করে! সারা জীবন পাশে থেকেছেন। তারপর এই লকডাউনের মাঝে এই বয়সেও প্রায় সব কর্মসূচিতে হাজির গৌরীদি। তাঁর এই 'অ-শোক যাপন'-এ আমার ঈর্ষা হয়।

স্মৃতির দর্পণে অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

—প্রথম পাতার পর

প্রসারিত করেছে। কেননা তিনি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়েরই একজন পদস্থ কর্মী এবং কর্মী সংগঠনের সংগ্রামী নেতা। পরবর্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালন সমিতির নির্বাচিত সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালনের সূত্রে অশোকবাবুর সঙ্গে আমার নিরবচ্ছিন্ন সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এর পশ্চাৎপটে অবশ্যই কাজ করেছে মার্কসবাদী রাজনৈতিক মতাদর্শগত ঐক্যবোধ এবং সেই মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অংশগ্রহণ। মতাদর্শগত ঐক্যবোধে এক হলেও তার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অশোকবাবু এতটাই এগিয়ে ছিলেন যে তাঁর ধারে-কাছেও যেতে পারিনি, কিন্তু শিখেছি অনেক কিছু। সাতের দশকের শুরু থেকেই দেখেছি ও শুনেছি কংগ্রেসিদের কী অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে তাঁকে। পুলিশি অত্যাচারও কম সহ্য করতে হয়নি। কিন্তু বিন্দুমাত্র আত্মসমর্পণ তিনি করেননি। অন্যদিকে ১৯৭৭-এ রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসীন হবার পর ১৯৮১ সালে অনায়াসে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি থেকে ছুটি নিয়ে তিনি মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হন এবং তার জেলা কমিটির সদস্যপদ লাভ করেন। ১৯৮২ সালে তিনি দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী রামনারায়ণ গোস্বামীর আপ্ত-সহায়কের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। ক্ষমতার গর্বে কখনো তিনি বিন্দুমাত্র উচ্চমার্গীয় মনোভাবের শিকার হননি। একই রকম সরল ও সাধাসিধে জীবনযাপন করেছেন। প্রতিশোধস্পৃহার বশবর্তী হয়ে তাঁর উপর নির্মমতম আক্রমণের জবাবে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে প্রত্যাঘাতের পথেও কখনো যাননি। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির বর্ধমান জেলা কমিটির সদস্যপদ লাভ করার পর আমারও সৌভাগ্য হয়েছে কমিটির সভায় তাঁর পাশে বসবার।

এবার 'নতুন চিঠি'-র প্রসঙ্গে আসা যাক। ১৯৭৭ সালের ২৫ ডিসেম্বর এই সাপ্তাহিক পত্রিকার যাত্রা শুরু। সম্পাদক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী। বামপন্থা পত্রিকার ঘোষিত নীতি, কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনে দায়বদ্ধ। পরিবেশনগুণে তা জনপ্রিয়। বিশেষ করে তার শারদ সংখ্যাটির মান বিশেষ স্বীকৃতি অর্জন করে। ১৯৭৮ সাল থেকেই এই পত্রিকার সঙ্গে আমি যুক্ত হই। পত্রিকা প্রকাশের অতীত অভিজ্ঞতা আমার ছিল। এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হবার পর সে অভিজ্ঞতাও ক্রমশ নতুন মাত্রা অর্জন করে। বৃহত্তর দায়িত্বের বাধ্যবাধকতায় অশোকবাবুকে যখন বেশিরভাগ সময় কোলকাতায় কাটাতে হয়, তখন সাময়িকভাবে পত্রিকা দেখাশুনার ভার গ্রহণ করেন মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির প্রখ্যাত নেতা নিরুপম সেন। তাঁর সঙ্গে আমিও পত্রিকার কাজে আরও গভীরভাবে যুক্ত হয়ে পড়ি। অবশেষে ১৯৮৯ সালে আমাকেই সম্পাদকের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। সে দায়িত্ব এখনও পালন করে চলেছি। অশোকবাবু নতুন চিঠি পত্রিকা অফিসটিকে গড়ে তুলেছিলেন সুনির্দিষ্ট কর্মস্থান ছাড়াও বৃহত্তর সংযোগ ও মতবিনিময়ের একটি কেন্দ্র হিসাবে। কিছুটা আড্ডার স্থান হিসাবেও বটে। শেষের দিকে তিনি কমই আসতে পারতেন। কিন্তু নতুন চিঠি সেই ধারা এখনও বজায় রাখতে সচেষ্ট।

সবশেষে যে অসামান্য অভিজ্ঞতার কথা বলবো তা কেবল অশোকবাবু ও আমার এবং তার স্থান বাংলাদেশ। ১৯৯৯ সালের মার্চ মাস। অশোকবাবু তখন পশ্চিমবঙ্গ সমবায় ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান। তাঁর নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে 'সমবায়ের মধ্যে সমবায়' ব্যবস্থা হিসাবে স্বয়ম্ভর আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছে। বাংলাদেশে সমবায়-ভিত্তিক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক গড়ে তোলার বিশাল কৃতিত্বের অধিকারী নোবেলজয়ী মুহম্মদ ইউনুস-এর কর্মপ্রণালী পর্যবেক্ষণ ও তা থেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যবস্থাপনায় অশোকবাবুর সঙ্গী হিসাবে সেখানকার রাজধানী ঢাকা শহরে যাবার এবং গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সুবিশাল বহুতল বাড়িতে মুহম্মদ ইউনুস-এর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের বিরল সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। মুহম্মদ ইউনুস-এরই আত্যন্তিক সহযোগিতায় দেশের পাঁচটি জেলার প্রত্যন্ত গ্রামের অভ্যন্তরে গিয়ে ব্যাঙ্কগুলির কর্মপ্রণালী নিরীক্ষণে আন্তরিকভাবে সাহায্য করেছেন আন্তর্জাতিক কর্মসূচি বিভাগের উপ-মহাব্যবস্থাপক জান্নাত-ই-কাওনাইন—সকলের 'জান্নাত ম্যাডাম'। ব্যাঙ্ককর্মী ও পরিচালকদের পাশাপাশি গ্রামবাসীদের আন্তরিকতা ও সহযোগিতাও ছিল তুলনাহীন। ক্ষেত্রসমীক্ষা শেষে ১৯৯৯-এর ১৮ মার্চ ঢাকায় গ্রামীণ ব্যাঙ্কের হেড অফিসে ফিরে এসে একটি ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকারে আমরা মুহম্মদ ইউনুস-এর মুখোমুখি হলাম। পনোরো মিনিটের নির্ধারিত সময় কখন এক ঘন্টা পেরিয়ে গেছে। অন্য জরুরি আহ্বানে দু-একবার স্বল্পকালের জন্য উঠে যেতে হলেও পরমাগ্রহে তিনি আবার ফিরে এসে বসেছেন। এ স্মৃতি ভোলার নয়। ভোলার নয় আর একটি স্মৃতিও। যেটি হলো বর্ধমানের গর্ব সৈয়দ শাহেদুল্লাহর পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী বদরুদ্দিন ওমরের বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ আলাপচারিতা ও মধ্যাহ্নভোজন।

এর পর ঢাকা থেকে আমরা রওনা দিলাম বরিশালের দিকে। অনুরোধটা ছিল আমার, যা সাগ্রহে গ্রহণ করেছিলেন অশোকবাবু। অনুরোধের কারণ বরিশালের চাঁদসি গ্রাম ছিল আমাদের আদি নিবাস, যদিও দেশভাগের সময় পিতার কর্মসূত্রে আমরা রংপুরে থাকায় সেখান থেকেই বাস্তুহারা হয়ে চলে এসেছিলাম জলপাইগুড়ি জেলার আলিপুরদুয়ার শহরে, যেখানে আমাদের কিছু আত্মীয়স্বজন ছিলেন। সে অন্য কথা। কিন্তু এত ছোট বয়সে আমাকে বরিশাল ছেড়ে যেতে হয়েছিল যে এই বিরল সুযোগে আমাদের সেই আদি নিবাসকে ফিরে দেখবার এক গভীর আগ্রহ মনের ভিতরে কাজ করছিল। অশোকবাবু তা জানতেন এবং ঢাকা শহর থেকে যথেষ্ট দূরে হলেও বরিশাল যাওয়াটা বাংলাদেশ ভ্রমণের কর্মসূচির মধ্যেই রেখেছিলেন। স্টিমারে চেপে বিশাল নদী পেরিয়ে স্থলপথে দীর্ঘ যাত্রাশেষে চাঁদসিতে পদার্পণ। পিতৃপরিচয়ে আমার উপস্থিতি এলাকায় সাড়া ফেলে দিল। অভাবিত আন্তরিকতায় এলাকার মানুষজন প্রায় মিছিলের আকারে আমাদের সঙ্গে নিয়ে আমার পৈত্রিক নিবাস সহ সারা এলাকা ঘুরিয়ে দেখালো। জাতি-ধর্ম বোধের ঊর্ধ্বে সে এমন এক অভাবিত অভিজ্ঞতা যা অশোকবাবুকেও মুগ্ধ করেছিল। পরেও বহুবার তিনি সেই অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছেন।

মুহম্মদ ইউনুস-এর সঙ্গে যে দীর্ঘ সাক্ষাৎকারটি আমরা নিয়েছিলাম, তার পূর্ণ বয়ান মুদ্রিত হয়েছিল ২০০৭ সালে কলকাতা বইমেলায় 'নতুন চিঠি প্রকাশনা' কর্তৃক প্রকাশিত অশোকবাবুর 'স্বনির্ভরতার সন্ধানে' নাম পুস্তকে। এর আগে ২০০২ সালের কলকাতা বইমেলায়ও অশোকবাবুর লেখা 'স্বয়ম্ভরতা ও সমবায়ে পেশাদারিত্ব' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছিল 'নতুন চিঠি প্রকাশনা'। এ-ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে তাঁর লেখা বেশ কয়েকটি পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর সর্বশেষ ও সর্ববৃহৎ গ্রন্থ 'সমবায় ও মানব সভ্যতা' প্রকাশিত হয় ২০১৬ সালের কলকাতা বইমেলায়। প্রকাশক 'ফেডারেশন অব ওয়েস্টবেঙ্গল আরবান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ক্রেডিট সোসাইটিজ লিমিটেড'। গ্রন্থটির প্রাক্‌কথনে তিনি গ্রন্থটি রচনায় নতুন চিঠি পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে আমার যে বিশেষ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন তা তাঁরই মহানুভবতার প্রকাশ এবং আমার পক্ষে অবশ্যই গর্বের।

সময় অশোকবাবুকে ভুলবে না।

এক আপনজনের কাহিনি

—দুয়ের পাতার পর

চেয়েছেন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। তবেই শ্রমজীবী মানুষের মুক্তি। কিন্তু, এখন বুর্জোয়া-জমিদার রাষ্ট্রে? অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক দিয়ে যদি কিছুটা স্বস্তি দেওয়া যায়, মার্কসবাদী হিসাবে অবশ্যই সে উদ্যোগ নিতে হয়। তাই সমবায়। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে সমবায়ের সঙ্গে যুক্ত হয় স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী। তাঁর সম্পর্কে খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ অমিয় কুমার বাগচী মন্তব্য করেছেন, "কিন্তু শুধু আন্দোলন দিয়ে তো মরণোন্মুখ চাষিকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। তাকে দিতে হবে পুষ্টির জন্য আয় ও উপযুক্ত কাজ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার সমস্ত সুযোগ তার সামনে এগিয়ে দিয়ে তাকে স্বাধীন দেশের নাগরিকের মতো বাঁচতে দিতে হবে। সেইখানে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে সমবায়ের মাধ্যমে এগিয়ে যাওয়ার ডাক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গত এক দশক ধরে দেশের মধ্যে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গড়ে তার মধ্যে দিয়ে গরিব মানুষের সঞ্চয় ও কর্মক্ষমতাকে সংহত করে তাদের নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আয় করার চেষ্টাকে প্রণোদিত করা হচ্ছে।"

(মুখবন্ধ, স্বনির্ভরতার সন্ধানে)

সমবায় নিয়ে তো অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটাছুটি ছিল, গরিব মহিলাদের নিয়ে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গড়ায় প্রত্যন্ত গ্রামে ঘোরাঘুরি ছিল। তাঁর মতে, "পুঁজির অভাব আমাদের নেই, সেই পুঁজি রয়েছে আজ লক্ষ লক্ষ গরিব শ্রমজীবী মানুষের ঘরে। তাঁদের সংগঠিত করতে হবে সমবায়ে। এতদিন আমরা সমবায় করেছি; কিন্তু সমাজের ভিত্তি, সমাজের গরিব অংশ এতদিন ছিল সমবায়ের আঙ্গিনার বাইরে। স্বয়ম্ভরতা, ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে এই নির্ধন গরিব মানুষকে আজ আমরা সংগঠিত করছি "স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী—সমবায়ের মধ্যে সমবায়ে"। আজ তাই প্রয়োজন শ্রমিক, কৃষক, যুবক, মধ্যবিত্ত, মহিলা, সমবায় কর্মী-সহ সমস্ত মানুষের এগিয়ে আসার।" (ভূমিকা, স্বয়ম্ভরতা ও সমবায়ে পেশাদারিত্ব) ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গড়ে তোলায় বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা জানার জন্য নোবেল-জয়ী অর্থনীতিবিদ মুহম্মদ ইউনুসের সঙ্গে আলোচনা করতে 'নতুন চিঠি' সাপ্তাহিকের সম্পাদক অধ্যাপক জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্যকে সঙ্গী করে তিনি বাংলাদেশে যান।

সম্পূর্ণ মানুষ

চলনে-বলনে, পোষাকে-আষাকে অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন একেবারে সাধারণ, কিন্তু চিন্তায়-ভাবনায়, কাজে-কর্মে অসাধারণ। তিনি ছিলেন একজন সম্পূর্ণ মানুষ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তিনি বলতে পারতেন—

লাভক্ষতি-টানাটানি,
অতি সূক্ষ্ম ভগ্ন-অংশ-ভাগ,
কলহ সংশয়—
সহে না সহে না আর
জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি
দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়।।

—বর্ষশেষ

মৃত্যুর আগে পর্যন্ত অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনযুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন। জীবনের প্রতি আস্থা শেষ পর্যন্ত অটুট ছিল, মানুষের প্রতি বিশ্বাস অমলিন ছিল। এই-রকম মানুষই তো জীবনকে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন।

স্বপ্নোজ্জ্বল দিনের এক সেনানী

অরুণ মজুমদার

সেই সময়টা বড় দুঃসময়, বামপন্থীদের বিশেষ করে সিপিআই(এম) কর্মী সমর্থকদের কাছে। এশিয়ার মুক্তিসূর্যের খরতাপে দগ্ধ হচ্ছেন সবাই। বর্ধমানেও সেই ঐতিহাসিক উক্তি মুক্তিসূর্যের বর্ধমানে আমাদের পা রাখার জায়গা হয়েছে অচিরেই... বর্ধমানের একটি বিখ্যাত ঘটনা ঘটার পরে সমস্ত লেখাপড়া জানা বিভিন্ন অফিস কাছারিতে ট্রেড ইউনিয়ন করা বা ছাত্র সংগঠন করা মানুষদের উপর নেমে এল কংগ্রেসী ভৈরব বাহিনীর রুদ্র রোষ। প্রায় সবাই ঘরছাড়া পাড়া-ছাড়া এবং চাকরি-ছাড়া।

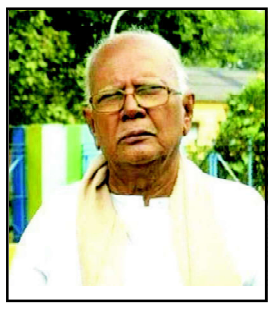

এমনই একজন বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী আন্দোলনের নেতা গণশক্তি প্রেসে মুদ্রণ পরিদর্শক রূপে যোগ দিলেন তিনি সুবিমল সেন। আমি নন্দন পত্রিকার সর্বক্ষণের কর্মী। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সব কাজই করতে হতো। মাসের মধ্যে ১৬/১৭ দিন থাকতে হতো গণশক্তি প্রেস পত্রিকা দপ্তরে। সেখানেই পরিচয় হল সাঁইবাড়ি মামলার অন্যতম অভিযুক্ত এই সুবিমল সেন-এর সঙ্গে। গৌরকান্তি ঝকঝকে চেহারার যুবক, এক মাথা কালো চুল পরিপাটি পোষাক নিয়েই তাঁর উপস্থিতি। সেখানেই প্রথমদিন দেখি কমিউনিস্টদের চিরায়ত ঢোলা পায়জামা পাঞ্জাবি পরিহিত শান্তশিষ্ট গোছের একজনকে। সুবিমলবাবুকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম উনি একজন স্কুল শিক্ষক।

ইতিমধ্যে কিছু গোপন কাজ করার জন্য একটা প্রেস চালাচ্ছিলেন সুবিমলবাবু। প্রকাশ্যে চাইনিজ রেস্তোরাঁয় মেনু কার্ড ছড়ানো। একদিন ধরা পড়লেন কলকাতা পুলিশের জালে। লর্ড সিনহা রোডে জেরার সময় টিকটিকিরা লাফিয়ে উঠলো—আরে এ যে সাঁইবাড়ির আসামী মৃদুল সেন।

জরুরি অবস্থা মিটে গেছে। ইন্দিরা গান্ধী সদলবলে পরাজিত। মৃদুলবাবুরা আবার সসম্মানে যোগ দিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে। ১৯৭৮ সালের জুলাই মাসে আমিও যোগ দিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ দপ্তরের কাজে যুক্ত অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়। একদিন বললাম, আপনাকে তো স্কুল শিক্ষক বলে জানতাম। উনি হেসে জানালেন—স্কুল থেকেই তো এখানে এসেছি।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী ইউনিয়নের সদস্য হলাম আমরা সবাই। তখন পর্যন্ত কংগ্রেসের কর্মীবন্ধুরা এই নামেই ইউনিয়নটি চালাচ্ছিলেন। প্রতিদিনই টিফিনে মিছিল মিটিং চলছে নতুন পে-স্কেলের দাবিতে। মিছিলে বক্তব্য রাখছেন মৃদুলবাবু, অশোকবাবু, পরে দিলীপ দুবে প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। আমরা সবাই ভাই তাই শান্তিকে কাজ করতে চাই। অশোকদা গলা কাঁপিয়ে মর্মস্পর্শী ভাষায় বক্তৃতা দিতেন। বক্তৃতার মাঝে মাঝেই বলতেন—তা হলে একটা গল্প বলি শোনো।

এভাবেই চলছিল। বর্ধমানের পুরানো 'নতুন পত্রিকা' পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় 'নতুন চিঠি' নামে অশোকদা একটি পত্রিকা প্রকাশ করে ফেলেছেন। হবিবুল্লাহ আনোয়ার সহ-সম্পাদক, অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদক ও প্রকাশক। অফিস নেই। সাধনা প্রেসে পত্রিকা ছাপা হয়. আনোয়ারদার বাড়িতে ভাঁজ হয়ে পত্রিকা বিলির ব্যবস্থা।

এক সময় ২০ নম্বর জে বি মিত্র রোডে ভাঙাচোরা বাড়ি. ব. দোতলার একটি ঘর এবং বারান্দা পাওয়া গেল। শুরু হল ২০ নম্বরের জীবন। নিরুপম সেন থেকে শুরু করে জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ বাবু সবাই ওখানে জমায়েত হতেন। রামকৃষ্ণবাবু সম্পাদকীয় লিখতেন। কখনো একদিনও দেরি হয়নি সম্পাদকীয় দিতে।

অশোকদার মাথায় এল একটা ছাপাখানার ব্যবস্থা করলে কেমন হয়? প্রথমে এক পাতার টাইপ কেনা হল সরস্বতী প্রেস থেকে। অবশ্য একাজটা আমিই করেছিলাম। কারণ ওখানে আমার জানাশোনা ছিল। অশোকদার স্বপ্ন ছিল পত্রিকা বড় বড় টাইপে ছাপা হবে। গ্রামের অল্পশিক্ষিত মানুষ যাতে বানান করেও পত্রিকা পড়তে পারেন। টাইপ কেনার জন্য নিজের মাইনের বদলে ঋণ নিলেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। একপাতা থেকে আস্তে আস্তে দুপাতা...। এক সময় একটা ছাপার মেশিন কেনার কথা হল। খুঁজেপেতে পেলাম একটি স্বল্প ব্যবহৃত ট্রেড্‌ল মেশিন। সেটিও আনা হল কলকাতা থেকে। এসবই অশোকদার আন্তরিক চেষ্টার প্রতিফলন। শহরে বা শহরের বাইরে কোন বিশেষ ঘটনা থাকলে অশোকদার নির্দেশে বেশি করে ছাপতে হতো। তাতে অবশ্য মাঝে মধ্যে পত্রিকা সব বিক্রি হত না। স্বপ্ন আর বাস্তবে তো ফারাক হয়েই থাকে। ভালো জিনিস, সত্য কথা মানুষ সহজে মেনে নেয় না। দুধ বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিক্রি করতে হয় কিন্তু সরাবখানার লাইন এই লকডাউনেও দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। বিকোচ্ছে অনেকগুণ বেশি দামে।

অশোকদা ছিলেন সমবায়ের প্রতি নিষ্ঠাবান। শ্রীধরপুর শতাধিক বছরের প্রাচীন সমবায়। জন্মসূত্রেই সমবায়ের মানসিকতা, পরবর্তীতে একাগ্র সৈনিক। বর্ধমান সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ওখান থেকেই বৃহত্তর পরিধিতে চলে যান কলকাতা। দুটি বৃহৎ অর্থকরী সংস্থান সঙ্গে চেয়ারম্যান হিসাবে যুক্ত ছিলেন দীর্ঘকাল। সেই চিরাচরিত পোষাক এবং সাদামাটা যাপিত জীবন অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। এই বৎসরগুলিতেও অশোকদার পত্রিকার সঙ্গে প্রাত্যহিক যোগাযোগ ছিল না। তবে সব সময়ই চেষ্টা করতেন পত্রিকার উন্নতির জন্য।

সমবায় আন্দোলনের একটি সুবৃহৎ ইতিহাস লিখতে গিয়ে মাঝে মাঝেই থমকে যাচ্ছিলেন—কাজ এগোচ্ছে না। আমি পরামর্শ দিলাম একজন পেশাদার কম্পিউটার অপারেটর নিন, কাজ এগোবে। এবং সেভাবেই 'সমবায় আন্দোলনের ইতিহাস' বইটি প্রকাশিত হল। এটিকে ইংরাজি অনুবাদ করতে অনুরোধ জানিয়েছিলাম। অসুস্থ শরীর নিয়ে নিজে বেশিদূর এগোতে পারেননি। অনুবাদ হলে এটি একটি বিশ্বজনীন পরিচিতি পেত।

একটা সময় পত্রিকায় 'ইহা কি সত্য'? শিরোনামে কিছু বিষয় ছাপা হতো। আসানসোলের কোনো এক কংগ্রেস নেতার চিঠি 'প্রিয় পুলিশ...' ছাপার পর পত্রিকার বিরুদ্ধে মামলা হয়। সহ সম্পাদক আনোয়ারদা সাইকেলে করে স্টেশন যাচ্ছেন ভোরবেলা। পথে সাইকেল টাকা-পয়সা সব ছিনতাই হয়ে যায়। এক সময় পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা নিয়ে বর্ধমানের বিভিন্ন জায়গায় স্টল করে পত্রিকা বিক্রি করা হতো। শংকরদা (সরকার) থাকতেন, অশোকদার মেয়ে তোতা থাকতো এবং আরো কয়েকজন পত্রিকা বিক্রি করতেন একটা পরিবারের মানসিকতা নিয়ে। আহা, তোতা চলে গেল অকালে। ভালো অভিনয় করতো, ভালো আবৃত্তিও। একটা সময়ে বর্ধমানের প্রগতিশীল বেশ কয়েকজন মিলে তৈরি করেছিলেন একটি নাট্যদল—'অন্বেষা'। অশোকদা, মৃদুল সেন, গৌরী ব্যানার্জী, স্বপ্না সেন, অমল ব্যানার্জী প্রমুখ অভিনয় করতেন। তারই সঙ্গে ভালবেসে তোতার ভালো নাম রেখেছিলেন অন্বেষা। সে এক দুঃখমেদুর স্মৃতি।

কোলকাতার পাট চুকিয়ে একটা সময় বর্ধমানে ফিরে এলাম। প্রতিদিনই নতুন চিঠি দপ্তরে আসতেন। ও হ্যাঁ, দপ্তর কিন্তু উঠে এসেছে ২০ নম্বর জে বি মিত্র রোড থেকে আরতি সিনেমা লেনের বিশ্বনাথ বণিকের বাড়ির নিচতলার মার্কেটের একটা ঘরে। অশোকদার ব্লাড সুগার প্রচুর। নিয়মিত সুচ ফোটানোর একটা ব্যাপার ছিল। সারাদিন এবং রাত্রে বেশ কয়েকবার সুগার টেষ্ট করতেন নিজে নিজেই। এ অবস্থায়ও প্রায় দিনই একটু সুস্থ থাকলে নতুন চিঠি দপ্তরে আসতেন। কর্মীদের নতুন নতুন দিশা দিতে চেষ্টিত হতেন। অসুস্থ শরীর নিয়েও কোলকাতা বা অন্য কোথাও মিটিংগুলিতে নিয়মিত হাজিরা দিতেন। বছরদুই আগেও নতুন চিঠি পরিবারের সঙ্গে বিহারিনাথ পাহাড়ে চলে গেলেন। অদম্য উৎসাহ। প্রতি বছরই নিয়মিত উত্তরবঙ্গে চা বাগানের অতিথিশালায় কয়েকটা দিন কাটিয়ে আসতেন। একঘেয়েমি কাটাতে এই স্বল্প ভ্রমণের জুড়ি নেই।

লক্ষ লক্ষ মানুষের মতো সুন্দর একটা সৌরকরোজ্জ্বল প্রভাতের স্বপ্ন দেখতেন তিনিও। পৃথিবীটা ক্রমশ দানবের কুক্ষিগত হয়ে যাচ্ছে—এ ক্ষোভ লক্ষ মানুষের ক্ষোভ—এক্ষোভে আমরা প্রত্যেকেই সামিল।

অশোকদা দীর্ঘকাল আমাদের স্মৃতিতে অমলিন থাকুন।

প্রয়াত অশোক ব্যানার্জীর মরদেহে লাল পতাকা দিয়ে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন অরিন্দম কোঙার ও অমল হালদার।

'হে সখা মম হৃদয়ে রহ'

—*তিনের পাতার পর*

ব্যানার্জীর চোখে জল দেখেছিলাম। তোতা পরবর্তীকালে স্বাভাবিকভাবেই বিবাহ-বিচ্ছিন্ন হয় এবং পরবর্তীতে অশোক ব্যানার্জীর আপত্তি ও অনেক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিন্টিং বিভাগে ওকে নিযুক্ত করার ব্যবস্থা করলাম। তোতাও যেন নতুনভাবে বাঁচার রসদ পেল—আবার গ্রুপ থিয়েটারে যোগদান করলো, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের নাট্যাভিনয়ে ও যোগ দিয়েছে এবং একজন সুঅভিনেত্রী হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে।

আমার মেয়েকে অশোক ব্যানার্জী ডাকতো 'মেমসাহেব' বলে। আমার মেয়ে বর্ধমানে এলেই অশোক ব্যানার্জীও যেমন আমার বাড়ি আসত, তেমনি আমিও যেতাম ওর বাড়ি আমার নাতনী সহ। আমার নাতনী এলেই অশোক ব্যানার্জী ওর সঙ্গে নানারকম গল্প করে জমিয়ে রাখতো। কর্মোপলক্ষে ব্যাঙ্গালোর গিয়ে আমার মেয়ের বাড়িতেও অশোক ব্যানার্জী গিয়েছিল। এমনিতে রিক্সা নিয়ে আমাদের বাড়ি এসে ঘন্টার পর ঘন্টা আড্ডা দিতো সুযোগ পেলেই। আমরাও ওর বাড়ি যেতাম—নানান বিষয়ে আলোচনা হতো, আবার মতপার্থক্যও হতো, কিন্তু মনান্তর কখনোই হতো না। জ্যোতি বসুর প্রধামন্ত্রীত্ব গ্রহণ করার ব্যাপারে অশোক ব্যানার্জীর সঙ্গে আমার তীব্র মতপার্থক্য হল—ও বিপক্ষে ক্ষার আমি পক্ষে। কিন্তু পরক্ষণেই আবার স্বাভাবিকভাবেই কথাবার্তা হল অন্যান্য বিষয়ে।

তোতার অকালমৃত্যু অশোক ব্যানার্জীকে শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে স্বভাবতই ভয়ানক বিপর্যস্ত করে। সুগার ক্রমশ বেড়ে যেতে থাকে এবং অন্যান্য শারীরিক অসুস্থতাও বাড়তে থাকে। নিজের অসুস্থতার ব্যাপারে প্রচণ্ড রকমের নিয়মানুবর্তী থাকলেও ক্রমাগত শরীর ভাঙছিল। নিজের বাড়ি বিক্রি করার সিদ্ধান্ত যখন নিল আমি প্রাথমিকভাবে সে সিদ্ধান্ত সমর্থন করতে পারিনি। কিন্তু যখন বলল যে ও ওষুধের টাকা যোগাড় করতে সর্বস্বান্ত হয়ে যাচ্ছে, তখন আর কিছু বলার জায়গা ছিল না। ভাড়াবাড়ি অরুণ রায় (ভূতি)-র বাড়িতে চলে এল। ওরা সাদরে অশোক ব্যানার্জী ও গৌরী ব্যানার্জীকে একেবারে আপন করে নিল, দেখভাল করার ব্যবস্থা করল।

নিজের অসুবিধা সত্ত্বেও বাড়ি বিক্রির টাকা থেকেই পার্টি ফাণ্ডে এবং সেবাসমিতির ফান্ডে অর্থ প্রদান করে—যেটা অশোক ব্যানার্জী বলেই সম্ভব। পার্টির প্রতি অপরিসীম ভালোবাসা, মমত্ব ও দায়বদ্ধতার যে পরিচয় অশোক ব্যানার্জী দিয়েছে তা আমাদের চিরকাল অনুপ্রাণিত করবে। এপ্রসঙ্গে গৌরী ব্যানার্জীর অবদানও কম নয়। অশোক ব্যানার্জীর যোগ্য জীবনসঙ্গী গৌরী ব্যানার্জী, যার অবদান অশোক ব্যানার্জীর জীবনকে গৌরবান্বিত করেছে।

আফশোস রয়ে গেল, অন্তিমকালে করোনার আবহে লকডাউনের জন্য আমার বন্ধুর সঙ্গে শেষ দেখা হল না। বিদায় বন্ধু—লাল সেলাম। বলি—'হে সখা মম হৃদয়ে রহ'।

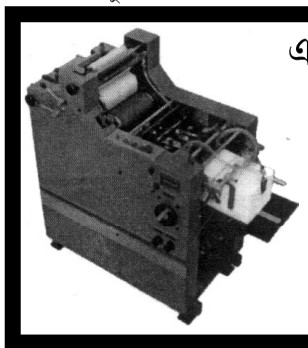

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। বার্তা সম্পাদক : দিনেশ ঝা। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, অস্থায়ী মুদ্রক ও প্রকাশক দিনেশ ঝা কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা